টেকবাংলা : অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত

টেকবাংলা

বাংলাদেশে ও তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য দেশে প্রযুক্তি উদ্ভাবন, উন্নয়ন ও বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি নিয়ে গঠিত হয়েছে টেকবাংলা । স্থানীয় প্রযুক্তির উন্নয়নে সাহায্য প্রদানের সাথে সাথে টেকবাংলা উন্নত বিশ্বের যে সব প্রযুক্তি বাংলাদেশ সহ তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য দেশের আর্থসামাজিক উন্নতিতে সরাসরি ব্যাবহার করা সম্ভব, তাকে লাগসই প্রযুক্তি হিসেবে বাস্তবায়নে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে।

টেকবাংলার শ্লোগান হচ্ছে "প্রযুক্তি, শুধু সাহায্য বা বিনিয়োগ নয়"। টেকবাংলা মনে করে তৃতীয় বিশ্বের, বিশেষতঃ বাংলাদেশের উন্নতির জন্য একই সাথে সামাজিক ও প্রাযুক্তিক উন্নয়ন অপরিহার্য। এই প্রেক্ষিতে টেকবাংলার উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশ সহ তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য দেশের প্রাযুক্তিক উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা রাখা। মেধাপাচার এই সব দেশের উন্নতির একটি প্রধান অন্তরায়। টেকবাংলার আকাঙ্খা প্রবাসী দেশবাসীর মেধাকে দেশের উন্নতিতে ব্যবহার করা।

টেকবাংলা তাদের কর্মকান্ডের অংশ হিসেবে বছরে দুটো সম্মেলনের আয়োজন করে। একটি অনুষ্ঠিত হয় বাংলাদেশে, অন্যটি কোন শিল্পোন্নত দেশে। তাছাড়া অন্যন্য প্রাযুক্তিক বিষয়ে টেকবাংলা নিয়মিত ওয়ার্কসপের আয়োজন করে।

টেকবাংলা প্রজেক্ট

যখন কোন টেকনিকাল প্রজেক্ট এমন পর্যায়ে যায় যে তাকে বাংলাদেশে বাণিজ্যিক ভাবে সফলতার সাথে বাস্তবায়িত করা সম্ভব এবং যাকে টেকবাংলা নির্ধারিত ফরমেটে প্রকাশ করা যায়, তখন সেই প্রজেক্টকে টেকবাংলা প্রজেক্ট হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। যেহেতু কোন টেকনিকাল প্রজেক্টে প্রযুক্তিবিদ (Technologist), বিনিয়োগকারী (Investor) এবং বাণিজ্যিক সংগঠক (Entrepreneur) (TIE) তিন জনেরই ঘনিষ্ট অংশগ্রহণ প্রয়োজন, সেই জন্য টেলবাংলা তাদের কাছ থেকে আলাদাভাবে প্রস্তাব পেতে আগ্রহী।

কি ভাবে একটি টেকবাংলা প্রজেক্ট তৈরী করা যায়?

প্রাথমিক ভাবে বিভিন্ন সম্মেলন, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, সাংগঠনিক যোগাযোগ, বাণিজ্যিক প্রচারমাধ্যম এবং টেকবাংলার অন-লাইন ওয়েব সাইটের মাধ্যমে প্রস্তাব আহ্বান করা হয়। আগ্রহী ব্যক্তিরা প্রাথমিক প্রজেক্ট প্রস্তাব ফরমেট (Initial Project Information, IPI), যা টেকবাংলার অন-লাইন থেকে ডাউনলোড করা যায়, তা ব্যবহার করে প্রস্তাব জমা দিতে পারেন। এই ফরমেটটি এক পাতায় সীমাবদ্ধ এবং শুরুতে প্রজেক্ট সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা পেতে ব্যবহার করা হয়।

টেকবাংলা এই IPI বাংলাদেশ ও অন্যত্র আগ্রহী বিনিয়োগকারী এবং বানিজ্যিক সংগঠকদের কাছে বিতরণ করে। এ ক্ষেত্রে যে সব ব্যবসা বাংলাদেশে সম্পাদিত হবে, সেগুলোর উপর বিশেষ গুরুত্ত দেয়া হয়। যখন কেউ এই প্রজেক্টে আগ্রহ প্রকাশ করে, তখন দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয়। এই পর্যায়ে প্রস্তাবকারীদের নিকট থেকে তাদের প্রজেক্টের আরো বিস্তারিত বর্ণনা (৩-৪ পাতা) আহ্বান করা হয়।

টেকবাংলার ভূমিকা কি?

টেকবাংলা বিভিন্ন TIE-এর ভিতর সমন্বয়কারী হিসেবে কাজ করবে। কোন TIE টেকবাংলার মাধ্যমে কোন প্রজেক্টে হাত দিলে, পরবর্তীতে তারা সাহায্যের জন্য আবার টেকবাংলার কাছে আসতে পারেন। সমন্বয়কারী হিসেবে টেকবাংলা প্রয়োজনমত এককালীন ফি-ও গ্রহণ করতে পারে। এই ফি কি ভাবে নেয়া হবে অথবা কত নেয়া হবে, তা এখনও বিবেচনাধীন আছে।

টেকবাংলা প্রজেক্ট নির্বাচন প্রণালী

এ ক্ষেত্রে টেকবাংলা প্রজেক্ট নির্বাচন কমিটি কিছু প্রাথমিক নীতি নির্ধারণ করেছে। তার মধ্যে অন্যতম হলোঃ

- প্রজেক্টটি অবশ্যই প্রযুক্তি ভিত্তিক হতে হবে,
- ট্রেইনিং প্রজেক্ট বিবেচিত হবে না,
- পুরনো প্রযুক্তির সরাসরি বাস্তবায়ন বিবেচিত হবে না,
- আইডিয়াকে প্রজেক্ট হিসেবে বিবেচনা করা হবে না,
- শুধু নীতিনির্ধারণ সংক্রান্ত আলোচনা প্রজেক্ট হিসেবে বিবেচিত হবে না,
- প্রস্তাবিত প্রযুক্তির বানিজ্যিক চাহিদা থাকতে হবে,
- প্রজেক্টটি কখন বাস্তবায়িত করা সম্ভব সে সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকতে হবে।

প্রজেক্টটি নির্বাচনের ব্যাপারে বিস্তারিত প্রণালী এখনও বিবেচনাধীন আছে।

টেকবাংলা প্রজেক্টের বর্তমান অবস্থা

আটলান্টিক সিটি, নিউ জার্সী, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, ২০০০ সালের ২৮-৩০শে এপ্রিল Technology Transfer (TT2000 North America) সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সম্মেলনে ২২টি প্রজেক্টকে প্রাথমিক ভাবে নির্বাচন করা হয়। এর মধ্য থেকে ১৩টি প্রজেক্টের বিস্তারিত বর্ণনা আহ্বান করা হয়। এগুলো পরবর্তীতে ডিসেম্বর ২০০০ সালে বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত Technology Transfer সম্মেলনে আলোচনা করা হয়। বিনিয়োগকারী এবং বাণিজ্যিক সংগঠককারীদের কাছ থেকে অনুকূল

সাড়া পাওয়া যায়। এর মধ্যে তথ্য প্রযুক্তি, জৈব প্রযুক্তি , রসায়ন প্রযুক্তি, টেলিকমিউনিকেশন, শক্তি, উৎপাদন, বিদ্যুত এবং পরিবেশ সেক্টর বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

এ গুলোর মধ্যে তথ্য প্রযুক্তি, টেলিকমিউনিকেশন এবং পরিবেশ সেকটরে বেশ কিছু প্রজেক্টের বাস্তবায়ন অনেকদূর এগিয়ে গেছে। বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত সফল Technology Transfer সম্মেলনের পর বাংলাদেশ সরকার ১০০ কোটি টাকার Equity and Entrepreneurship Fund (EEF) ঘোষণা করে। এই ফান্ড মূলতঃ তথ্য প্রযুক্তি, এবং জৈব প্রযুক্তি ভিত্তিক প্রজেক্টকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করবে।

<u>ভবিষ্যত লক্ষ্য</u>

টেকবাংলা প্রযোজিত প্রজেক্ট গুলোর সফলতার সম্ভাবনা খুবই উজ্জ্বল। টেকবাংলা এই প্রজেক্টগুলোকে সব রকমের সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান করার জন্য সংকল্পবদ্ধ। একই সাথে ২০০১ সালের আগষ্টে হিউস্টন, টেক্সাসে অনুষ্ঠিতব্য Technology Transfer সম্মেলনের জন্য টেকবাংলা প্রস্তুতি নিচ্ছে।

সম্প্রতি টেকবাংলা প্রজেক্ট কমিটি প্রতিটি প্রজেক্টের জন্য Project Requirement Document (PRD) তৈরীর প্রস্তাব করেছে ।

বর্তমানে সঙ্গত কারণেই টেকবাংলা তথ্য প্রযুক্তি এবং টেলিকমিউনিকেশন সেক্টরের প্রজেক্ট গুলোর উপর বিশেষ জোর দিচ্ছে। বাংলাদেশ সরকার সফটওয়ার, খাদ্য এবং কৃষিভিত্তিক প্রজেক্ট গুলোকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। বেসরকারী খাতে বাংলাদেশে অন্যান্য প্রযুক্তির ব্যাপারে যথেষ্ট উৎসাহ রয়েছে। টেকবাংলার উদ্দেশ্য হচ্ছে তথ্য প্রযুক্তি এবং যোগাযোগ সংক্রান্ত বিষয়ের প্রজেক্ট গুলোর সাথে সাথে অন্যন্য প্রযুক্তিভিত্তিক প্রজেক্টকেও উৎসাহিত করা।

টেকবাংলার প্রজেক্ট গুলো বাস্তবায়নে সাহায্য করার জন্য ঢাকায় একজন কর্মকর্তা নিয়োগের প্রস্তাব বর্তমানে টেক বাংলা স্টিয়ারিং কমিটির বিবেচনাধীন রয়েছে।

টেকবাংলার লক্ষ্য

- হিউস্টন, টেক্সাসে অনুষ্ঠিতব্য Technology Transfer সম্মেলনের জন্য নতুন প্রজেক্ট আহবান করা
- ঢাকায় একজন কর্মকর্তা নিয়োগ
- বিভিন্ন প্রচারমাধ্যমে প্রজেক্ট আহ্বান করা
- কমিটি কো-অর্ডিনেটরকে সাহায্য করার জন্য একজন কমিটি সেক্রেটারী নিয়োগ করা
- কমিটির মেয়াদ ২ বছরে সীমাবদ্ধ রাখা।

মূল রিপোর্ট : সাবির মজুমদার
অনুবাদ ও অনুলিখন : ফুয়াদ রাহমান

BUYING, SELLING or REFINANCING

Dedicated to Providing the Best Service

Residential Sales

- Single Family Homes
- Townhomes/Condos
- Investment Properties
- Lots and Land
- Free Professional Counseling

Loans

- Fixed Rates
- Adjustable Rates
- Low or No Down Payments
- Less than Perfect Credit Loans
- Cashout Refinancing
- No Green Card Loans

Our focus is to make the process of buying/selling a home as efficient and stress free as possible.

<u>Please call me for all your Real Estate needs :</u>

MUHAMMAD A. ALI

Hillsdale Properties
920 Hillview Ct., Suite 180
Milpitas, CA 95035

Phones : (925) 242-0370 (W)
(925) 830-2795 (H)
Fax : (925) 242-0371
E-mail : MALI764994@aol.com

ট্র্যানজিস্টর

ডঃ দলিলুর রহমান

এ শতাব্দীর সবচেয়ে বিস্ময়কর আবিষ্কার হলো সলিড স্টেট ট্র্যানজিস্টর। যার দাপটে গোটা পৃথিবী কম্পমান। আবিষ্কারের অর্ধশতাব্দী পর সব ধ্যান-ধারণাকে পাল্টিয়ে দিয়েছে, শুধু মানুষের কর্মক্ষেত্রেই নয়, জীবনযাত্রাকেও নিয়ন্ত্রণ করছে ট্র্যানজিস্টর। এখন কম্পিউটার চিপ যার মধ্যে লক্ষ লক্ষ ট্র্যানজিস্টর বুনোন রয়েছে তা শুধু যে কম্পিউটারে কাজ করছে তা নয়, গাড়িতে, টেলিভিশনে, টেলিফোনে, ঘরের দরজায়, এমন কি টয়লেট সিটে, মোট কথা দৈনন্দিন জীবনে যা কিছু দরকার তার প্রায় সবকিছুতেই চিপগুলো কাজ করছে। সব ইলেকট্রনিক্সই এখন কম্পিউটার সমন্বিত এবং এর বিক্রিত অর্থের পরিমাণ প্রতি বছর প্রায় ৫০০ মিলিয়ন ডলার যা অচিরেই ট্রিলিয়ন ডলারে যেয়ে দাঁড়াবে।

ফলে এগুলো পঙ্গপালের মতো ছড়িয়ে যাচ্ছে পৃথিবীতে। ট্র্যানজিস্টরগুলো এখন এতো ক্ষুদে যা মাইক্রোবের সাথে তুলনীয় এবং যতো ক্ষুদে ততোই এর ক্ষমতা বেশি। পৃথিবীতে এক সময় ধারণা ছিল "যতো বড় ততো ভালো" যে ধ্যান-ধারণার উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছিল টাইটানিক, এমপায়ার স্টেট বিল্ডিং। পুরানো সে ধ্যান-ধারণাকে ট্র্যানজিস্টর ভেঙে ধুলিস্যাৎ করে দিয়েছে। দিন দিন ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হচ্ছে আর বেড়ে যাচ্ছে এর ক্ষমতা অসম্ভবকে সম্ভব করার। ট্র্যানজিস্টর গোটা পৃথিবীকে করেছে ছোট, যোগাযোগ ব্যবস্থাকে করেছে তাৎক্ষণিক আর বিল গেট্‌স্‌কে করেছে পৃথিবীর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ধনী।

১৯৪৭ সালের ক্রিস্টমাসের দুইদিন আগে এটিএ্যান্ডটি'র তিনজন বিজ্ঞানী ওয়াল্টার ব্র্যাটেইন, জন বারডেন ও উইলিয়াম শকলে সলিড স্টেট ট্র্যানজিস্টর আবিষ্কার করেন। জন্মলগ্নে এই প্রথম সলিড স্টেট ট্র্যানজিস্টরটি দেখতে একটি তুচ্ছ বস্তু বই অন্য কিছু মনে হওয়ার কোনো কারণ ছিল না। এটা একটা পেপার ক্লিপকে একটা ক্রিস্টালের সাথে আটকে দেয়া কিছু মনে হতে পারে মাত্র। যাঁরা এর জন্মদাতা তাঁরাও ঠিক প্রথমে এর অসম্ভব ও অসাধারণ ক্ষমতার কথা চিন্তা করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। মারে হিলে এটিএ্যাণ্ডটিতে সেদিন যে শিল্প বিপ্লবের সূচনা হয়েছিল আজ তা অর্থনৈতিক দানবে পরিণত হয়েছে।

ট্র্যানজিস্টর হলো এক ধরনের সুইচ। সুইচ দিয়ে আমরা যেমন আলো নেভাতে ও জ্বালতে পারি, ট্র্যানজিস্টরও তাই। এর মধ্যে আছে একটি উৎস, একটি গেট ও একটি ড্রেইন। উৎস দিয়ে বৈদ্যুতিক শক্তি ঢোকে, ড্রেইন দিয়ে বের হয়ে যায় আর গেট হচ্ছে বিদ্যুতের প্রবাহ বন্ধ ও খোলার জন্য। এছাড়াও ট্র্যানজিস্টর বৈদ্যুতিক শক্তির পরিমাণ বাড়িয়ে দিতে পারে অর্থাৎ কম ভোল্টেজ উৎস দিয়ে প্রবেশ করে আর যখন ড্রেইন দিয়ে বের হয়ে যায় তখন বেশী ভোল্টেজ হয়ে বের হয়।

যখন কোনো ধনাত্মক চার্জ ট্র্যানজিস্টর এর ভেতর দিয়ে চালানো হয়, ধনাত্মক চার্জ কন্ডাকটিং পলিসিলিকনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। কন্ডাকটিং পলিসিলিকনের চারপাশে নন কন্ডাকটিং সিলিকন ডাই অক্সাইড থাকে। ধনাত্মক চার্জ, p-টাইপ সিলিকন এর ঋনাত্মক চার্জ বাহী ইলেকট্রনকে আকর্ষণ করে। p-টাইপ সিলিকনে সূক্ষ্ম পরিমাণ বোরন মেশানো থাকে। p-টাইপ সিলিকন দুটি n-টাইপ সিলিকনের স্তরকে আলাদা করে রাখে। n-টাইপ সিলিকনে সূক্ষ্ম পরিমাণ আর্সেনিক মেশানো থাকে। ধনাত্মক চার্য, p-টাইপ সিলিকন এর ঋনাত্মক চার্য বাহী ইলেকট্রনকে আকর্ষণ করার ফলে একটি শূন্যতার সৃষ্টি হয় এবং তা পূর্ণ করার জন্য সোর্স থেকে ইলেকট্রন n-টাইপ সিলিকনের মাধ্যমে p-টাইপ সিলিকনে প্রবেশ করে এর ফলে n-টাইপ সিলিকনের মধ্য দিয়ে ইলেকট্রন ড্রেইন দিয়ে বের হয়ে যায়। এভাবেই সার্কিট পূর্ণ হয়, একে বলে on বা ১ এবং ১ বিট বলা হয়ে থাকে। আর যদি ধনাত্মক চার্যের পরিবর্তে কন্ডাকটিং পলিসিলিকনে ঋনাত্মক চার্য প্রয়োগ করা হয় তাহলে সোর্সের ইলেকট্রন বিকর্ষিত হয় ট্র্যানজিস্টর তখন বন্ধ হয়ে যায়, একে বলে off বা 0। এভাবেই ট্র্যানজিস্টর একটি সুইচ এর কাজ করে।

১৯৩০ সনের দিকে এটিএ্যাণ্ডটিতে টেলিফোনের কথাবার্তা উন্নত করার জন্য খুব জটিল ও ব্যয়বহুল ব্যবস্থা চালু ছিল; ভ্যাকুয়াম টিউব ও রিলে সুইচ ব্যবহার করা হতো। ভ্যাকুয়াম টিউব ট্র্যানজিস্টরের কাজ করতো। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে টেলিভিশনের পিকচার টিউবই একটি ভ্যাকুয়াম টিউব। অন্যান্য কাজের মধ্যে টেলিভিশনের সিগন্যালকে বাড়িয়ে দেয়া ও শক্তিশালী করাই ভ্যাকুয়াম টিউব এর প্রধান কাজ। ভ্যাকুয়াম টিউব এর সমস্যা হলো এগুলি খুব গরম হয়ে যায় ও ওজনে অসম্ভব ভারী।

১৯৪৬ সালে প্রথম এনিয়াক নামে যে কম্পিউটার তৈরী করা হয় তার মধ্যে ১৮০০০ ভ্যাকুয়াম টিউব ব্যবহার করা হয়েছিল, ওটির ওজন ছিল ৫০ টন, দুই হাজার বর্গফুট জায়গা দখল করত অথচ তার মধ্যে মাত্র ২০টি শব্দ স্টোর করা যেতো। এই ভ্যাকুয়াম টিউব এর কারণেই এটিএ্যাণ্ডটি'র টেলিফোন ব্যবস্থা ছিল, জটিল ও ব্যয়বহুল। সে সময় এটিএ্যাণ্ডটি'র প্রেসিডেন্ট মারভিন কেলীর স্বপ্ন ছিল যে সম্ভবত সেমিকণ্ডাক্টার দিয়ে এ সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে।

কেলীর নেতৃত্বে এটিএ্যাণ্ডটি'র বেল ল্যাবে সলিড স্টেট ট্র্যানজিস্টর উৎপত্তির উদ্যোগ নেয়া হয় যাতে ভ্যাকুয়াম টিউব এর পরিবর্তে ট্র্যানজিস্টর ব্যবহার করা হয়। কেলী এমআইটি থেকে শকলে-কে নিয়োগ করেন এবং তাকে এর দায়িত্ব দেন।

প্রথমে তিনি কপার অক্সাইড নিয়ে কাজ শুরু করেন। পরে জার্মেনিয়াম ও সিলিকা নিয়ে "ফিল্ড ইফেক্ট" এর উপর গবেষণা করেন। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো শকলেরও আগে এ লাইনে একজন বিজ্ঞানী গবেষণা

করছিলেন। তার নাম জুলিয়াস লিলিনফেল্ড, একজন পোলিশ আমেরিকান পদার্থবিদ। ১৯২০ সালের দিকে তাকে একটা পেটেন্ট দেয়া হয় যেখানে তিনি "ফিল্ড ইফেক্ট এ্যামপ্লিফায়ার" তৈরীর কথা লিখেছেন কপার সালফাইড থেকে। তাঁর মতে, যদি শক্তিশালী বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র প্রয়োগ করা হয় ও এই সেমিকণ্ডাক্টারের ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎপ্রবাহ চালানো হয় তবে বিদ্যুৎপ্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় অর্থাৎ এর শক্তি বাড়ানো সম্ভব হবে। তবে তিনি এমন কোন এ্যামপ্লিফায়ার তৈরী করতে সক্ষম হন নি। ফিল্ড ইফেক্ট গবেষণায়, শকলেরও ভাগ্য খুলে যায় নি। তিনি দুইজন পদার্থবিদকে এ কাজের দায়িত্ব দেন।

এই দুইজন যেমন ছিলেন ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ, তেমনি ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ওয়াল্টার ব্র্যাটেইন ছিলেন কাউ বয় বলে খ্যাত, তাঁর রক্তে ছিল সমস্যা সমাধানের মন্ত্র। তাঁর বাবা ছিলেন বিজ্ঞানের একজন শিক্ষক। ব্র্যাটেইন যা বিশ্বাস করতেন তা জোর গলায় বলতে পারতেন। কিন্তু অন্যজন জন বারডেন ছিলেন তার উল্টো, তিনি ছিলেন ভীষণ নীরব প্রকৃতির। প্রিন্সটন থেকে আসা এই বিজ্ঞানী সম্পর্কে কথিত আছে যে বারডেন পদার্থবিদ্যার জন্য আশীর্বাদ যেমন বেটুভেন ছিলেন সঙ্গীতের জন্য। তবে তিনি জোরে মুখ খুলে তেমন বলতে পারতেন না।

যা হোক কাউ বয় ব্র্যাটেইন আর নীরব বারডেন মিলে যা আবিষ্কার করলেন তা অনেকটা দুর্ঘটনার মতই। তাঁরা জার্মেনিয়াম ক্রিস্টাল নিয়ে সকলের আইডিয়া "ফিল্ড ইফেক্ট" দেখার চেষ্টা করছিলেন কিন্তু কিছুই হচ্ছিল না। বারডেন মনে করছিলেন, ক্রিস্টালের পৃষ্ঠে পরিবেস্টনকারী বৈদ্যুতিক চার্জের জন্য নিয়ন্ত্রিত বিদ্যুৎ শক্তি ঢুকতে পারছে না। ক্রিস্টালের পৃষ্ঠকে পরিবর্তন করার জন্য তাঁরা জার্মেনিয়ামের ভি (V) আকৃতির একটি গোঁজ তৈরী করেন যার দুই প্রান্তে স্বর্ণের ছোট পাত লাগানো হয়।

এই স্বর্ণের পাতের মাধ্যমে একটি স্প্রিং সংযোগ করা হয় যা জার্মেনিয়ামের সাথে যোগ হয়। জার্মেনিয়ামকে তৃতীয় আর একটি ইলেকট্রোডের সাথে সংযোগ করে দেয়া হয় যা নিয়ন্ত্রণ চার্জ হিসাবে কাজ করে। বিদ্যুৎ প্রবাহ ভি এর এক প্রান্ত দিয়ে প্রবেশ করে এবং সেমিকন্ডাক্টারের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে অন্য প্রান্ত দিয়ে বের হয়ে যায়। এর ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহ চালিয়ে তাঁরা পরীক্ষা করে দেখেন যে বিদ্যুতের শক্তি বেড়ে যায়। সময়টা ছিল ডিসেম্বর ২৩, ১৯৪৭ সন, মারে হিলে, এটিএ্যাণ্ডটি'র বেল ল্যাবের ১নং দালানের চার তলায় পদার্থবিদ ওয়াল্টার ব্র্যাটেইন ও জন বারডেন পৃথিবীর প্রথম সলিড স্টেট ট্র্যানজিস্টরের উপর পরীক্ষা পর্যবেক্ষণ করে তাঁরা তাঁদের নোট বইয়ে ফলাফল লিপিবদ্ধ করেন, "value gain 100, power gain 40" এই পর্যবেক্ষণের মাধ্যমেই পৃথিবীর প্রথম সলিড স্টেট ট্র্যানজিস্টরের জন্ম হয়।

বেল ল্যাবের কেউ কেউ নতুন আবিষ্কারকে 'সেমিকণ্ডাক্টার ট্রায়ড' নাম দিতে চেয়েছিলেন, কেউ আবার বলছিলেন 'ইয়টট্রন'।

জন পায়ার্স নামে ব্র্যাটেইন এর এক বন্ধু ছিলেন, তিনিও বেল ল্যাবে গবেষণা করতেন আবার সাইন্স ফিকসনও লিখতেন। ব্র্যাটেইন তাঁকেই একটা নাম ঠিক করে দিতে বলেন, পায়ার্স এর নাম দিলেন ট্র্যানজিস্টর। এটিএ্যাণ্ডটি এই নবজাতক ট্র্যানজিস্টরটিকে ৭ মাসের জন্য ঘরবন্দী করে রাখে যাতে পেটেন্ট পায় এবং সামরিক বাহিনীর লোকেরা যাতে এটাকে জাতীয় গোপন বস্তু হিসাবে চিহ্নিত না করতে পারে। অবশেষে ১৯৪৮ এর ৩০ জুন নিউইয়র্কে একটি সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে এটাকে জনসম্মুখে প্রচার করা হয়। সাংবাদিকরা প্রত্যক্ষ করেন যে কেমন করে ট্র্যানজিস্টরের মাধ্যমে মানুষের কণ্ঠস্বরকে বাড়িয়ে দেয়া যায়।

এই যুগান্তকারী আবিষ্কার শকলেকে খুশি করার চেয়ে হতাশই করেছিল কারণ এরও আট বছর আগ থেকে তিনি কাজ করে আসছিলেন 'ফিল্ড ইফেক্ট' এর উপর; আর যাই হোক এই নতুন আবিষ্কার 'ফিল্ড ইফেক্ট' নয়। এর উপর পেটেন্ট লিখতে যেয়ে তিনি বেকায়দায় পড়েন কারণ লিলিনফিল্ডের পেটেন্ট বার হয়ে পড়ে।

কিন্তু তিনি দমে যান নি, মাস খানেকের মধ্যেই তিনি তার চিন্তা ভাবনার চূড়ান্ত রূপ দিতে সক্ষম হলেন, তিনি তৈরী করলেন জাঙ্কশন ট্র্যানজিস্টর ও সম্পূর্ণ নতুন তত্ত্ব; যার ফলে ট্র্যানজিস্টরের আরও একধাপ উন্নয়ন হলো। অনেকের মতেই শকলেকে এ শতাব্দির শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীদের একজন ধরা হয়, যদিও তিনি ছিলেন মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন। তিনি এক তত্ত্ব দেন যে জেনেটিক কারণে ব্ল্যাকদের আইকিউ কম, যার ফলে তিনি বর্ণবৈষম্যবাদী বলে অভিহিত হন।

এটিএন্ডটি-এর বৈজ্ঞানিকেরা আবিষ্কার করলেন ঠিকই কিন্তু এর ভবিষ্যত ক্ষমতা বুঝতে ব্যর্থ হন। শুধু তারাই নন এমন কি কর্পোরেশনের বড় কর্তারাও এর গুরুত্ব বুঝতে পারেন নি এবং তারা এই যুগান্তকারী আবিষ্কার বিক্রি করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেন। ব্র্যাটেইন ও বারডেন এর সুপারভাইজার শকলে ছিলেন খুব পারদর্শী, সাহসী ও বিতর্কিত ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তিনিই প্রথম বুঝতে পেরেছিলেন যে ট্র্যানজিস্টর সিলিকন দিয়ে তৈরী করা সম্ভব হবে। ব্র্যাটেইন ও বারডেন এর সাথে শকলের সম্পর্ক খুব একটা মধুর ছিল না। শকলের জন্যই বারডেন বেল ল্যাব ছেড়ে চলে যান। ক্যালিফোর্নিয়ায় আজকে যে টেকনোলজির তীর্থস্থান 'সিলিকন ভ্যালী' তা তখন ছিল শূন্যস্থান। এটিএ্যাণ্ডটি'র ট্র্যানজিস্টর টেকনোলজি দিয়ে মাউনটেইন ভিউতে শকলে সেমিকন্ডাক্টার কোম্পানী শুরু করেন, কিন্তু তিনি পুরোপুরি ব্যর্থ হন।

ট্র্যানজিস্টর এর আবিষ্কার ও তার উন্নয়ন অনেকটা হলিউডের ছবির মতো, গ্রীক ট্র্যাজেডির সাথে মেলানো যায়। কারণ এই মজার ঘটনাবলীর মধ্যে অনেকেই ব্যর্থ হয়েছেন; আবার যারা খুব বড় স্বপ্ন দেখতে পেরেছিলেন তাদের প্রজ্ঞার জন্যেই এর উন্নয়ন করতে পেরেছেন যেমন বিল গেট্স্ , পল অ্যালেন, গর্ডন মূর ও রবার্ট নইস।

১৯৫৮ সালে জ্যাক কিলবি ও রবার্ট নইস ইন্ট্রিগেটেড সারকিট আবিষ্কার করেন তখন মাত্র দুটো ট্র্যানজিস্টর ছিল একটা চিপে। ১৯৬৮ সালে গর্ডন মূর ও রবার্ট নইস মিলে ইনটেল কোম্পানী খোলেন আর ১৯৯৭-এ ইনটেলের পেন্টিয়াম-টু চিপে ট্র্যানজিস্টরের সংখ্যা হলো সাড়ে সাত মিলিয়ন। ২০০০ এ ইনটেলের সদ্য নতুন পেন্টিয়াম-থ্রি চিপে ট্র্যানজিস্টরের সংখ্যা ২৮ মিলিয়ন। একটা ডাক টিকিটের চেয়েও ছোট পেন্টিয়াম-থ্রি প্রসেসরের মধ্যে দুই কোটি আশি লক্ষ ট্র্যানজিস্টর, এ অকল্পনীয় ব্যাপার ভাবতেও অবাক লাগে।

অদূর ভবিষ্যতে যে ন্যানো কম্পিউটার তৈরি হবে তার মধ্যে যে চিপ ব্যবহার করা হবে তা হবে বর্তমান চিপের তুলনায় দশ লক্ষ গুণ বেশি শক্তিশালী অর্থাৎ তার মধ্যে ট্র্যানজিস্টরের সংখ্যা থাকবে দশ লক্ষ গুণ বেশি যার ফলে সে অনুপাতে তার ডাটা প্রসেসিং ক্ষমতাও বেড়ে যাবে। সারকথা, ট্র্যানজিস্টর–যত ক্ষুদ্র তত বেশি শক্তিশালী।

ফ্লেমিংটন, নিউ জার্সী।

যুক্তরাষ্ট্রের এইচ১বি ভিসা

জাকিয়া আফরিন

গোড়ার কথা

বাংলাদেশের পাপ্পান মাইক্রোসফ্ট থেকে H1B (এইচ১বি) পেতে যাচ্ছে - যে কোন বাঙালীর কাছে এ এখন মস্ত খবর। সিলিকন ভ্যালী ছাড়াও আমেরিকার নানা শহরে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বাঙালী এইচ১বি ভিসা নিয়ে কর্মরত। তবুও যে পাপ্পানের কথা বিশেষ করে বলা তার কারণ ঐ ভিসাই। সরাসরি এইচ১বি অর্থাৎ চাকুরির ভিসা নিয়ে আমেরিকায় আসা বাংলাদেশীদের সংখ্যা একেবারে হাতেগোনা। দেশত্যাগীদের বড় অংশই ইমিগ্র্যান্ট। আর রয়েছে ছাত্র এবং বেআইনীভাবে অবস্থানরত মানুষ। তবে বুয়েটের এক কৃতি ছাত্র যদি কয়েক বছরের মধ্যে অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে দেয় অবাক হওয়ার কিছু নেই।

এইচ১বি আসলে কি?

কাগজে কলমে দেখতে গেলে এইচ১বি ভিসা তেমন আহামরি গোছের কিছু নয়। কোন বিষয়ে চার বছরের ব্যাচলরস্ ডিগ্রী থাকলেই, এইচ১বি-এর জন্য আবেদন করা যায়। যদি ব্যাচেলর ডিগ্রীটি চার বছরের না হয়, তবে প্রতি বছরের জন্য তিন বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। অর্থাৎ যে কোন পেশাজীবী কোন বিষয়ে ব্যাচেলর ডিগ্রী (চার বছরের) অথবা কাজের অভিজ্ঞতা নিয়ে এইচ১বি-এর জন্য আবেদন করতে পারেন। আবেদনের জন্য মূলত প্রয়োজন হয় :

১. US Department of Labor (DOL) মনোনীত LCA (Labor Condition Application).
২. আবেদন করা পদের কাজটি বিশেষ যোগ্যতার একজন পেশাজীবীর পক্ষেই করা সম্ভব - এ ধারণাকে সমর্থন করে চাকুরিদাতা কোম্পানীর কাগজপত্র।
৩. আবেদনকারীর শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রমাণ - আমেরিকায় অর্জন করা ব্যাচেলরস্, মাস্টারস্ অথবা পি.এইচ.ডি. ডিগ্রীর কপি। আবেদনকারী অন্য দেশে পড়াশোনা করে থাকলে তার ডিগ্রীর কপি এবং আমেরিকার ডিগ্রীর মানদন্ডে এর অবস্থান ব্যাখ্যা করে প্রয়োজনীয় কাপজপত্র।
৪. আমেরিকার যে অঞ্চলে চাকুরি, সেখানে ঐ কাজ করার অনুমতি। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ক্যালিফোর্নিয়ায় আইনজীবী হতে হলে ক্যালিফোর্নিয়া বারের সদস্য হওয়া প্রয়োজন।
৫. এবং চাকুরিদাতা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আবেদনকারীর চুক্তির কপি।

এফ১ থেকে এইচ১বি

নিয়ম কানুনগুলো দেখে সহজ মনে হলেও আমাদের জন্য এটি সোনার হরিণই রয়ে গেছে। প্রতিবছর বাংলাদেশ থেকে বিশজনও এইচ১বি পায় কিনা সন্দেহ। এর কারণ কম্পিউটার বিজ্ঞানে আমাদের অনগ্রসরতাই নয়, শিক্ষা ব্যবস্থারও ভূমিকা রয়েছে। মাত্র তিন বছর হল কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় ব্যাচেলর ডিগ্রী চার বছরে উন্নীত করা হয়েছে। শুধুমাত্র এই কারণেই আগামী বছরগুলো আমাদের জন্য সুসংবাদ নিয়ে আসতে পারে। বর্তমানে এইচ১বি-তে কাজ করা বাঙালীদের বড় অংশটিই এফ১ ভিসা নিয়ে আমেরিকায় এসেছে। এফ১ ভিসার সুবিধা হল ডিগ্রী অর্জনের পর এক বছরের জন্য Practical training-এর সুযোগ থাকে। এই সময়ের মধ্যে ছাত্ররা কোন কোম্পানীর স্পন্সরশীপ পেয়ে যায় এবং এইচ১বি ভিসা নিয়ে ছয় বছর নিশ্চিন্তে আমেরিকায় কাজ করার সুযোগ পায়। ১৯৯০ সালের পর থেকে এইচ১বি ভিসাধারীদের গ্রীন কার্ডের পথ আর কন্টকাকীর্ণ নয়। তাই আমেরিকায় এফ১ ভিসা নিয়ে আসা একজন ছাত্র মূলত এইচ১বি-এর দিকে তাকিয়ে থাকে ইমিগ্র্যান্ট হবার আশায়। বিষয়টি কঠিন না হলেও কিছু সমস্যা এতে আছে। ভিসা প্রসেসিং এর স্বাভাবিক সময় ত্রিশ থেকে ষাট দিন হলেও বর্তমানে INS প্রায় চার মাস সময় নিচ্ছে। তাই প্র্যাকটিক্যাল ট্রেনিং চলাকালে এইচ১বি-এর আবেদনে একটু দেরী হলেই ঝামেলা - প্র্যাকটিক্যাল টেনিং শেষ হয়ে গেলেও এইচ১বি-এর দেখা নেই, এক্ষেত্রে ছাত্রটি আমেরিকায় অবস্থান করতে পারে, কিন্তু কাজের অনুমতি ছাড়া। অর্থাৎ যতক্ষণ INS থেকে এইচ১বি না পাওয়া যাচ্ছে, হাত পা গুটিয়ে বসে থাকা ছাড়া উপায় নেই। বাংলাদেশী ছাত্রের বড় অংশই তাই ভীত। প্র্যাকটিক্যাল ট্রেনিংয়ের একটি দিনও যেন নষ্ট না হয় সে চিন্তায় পড়া শেষ হবার বহু আগেই তারা চাকুরির আবেদন করে যাচ্ছে।

নতুন বিলে আশার বাণী

২০০০ সালের অক্টোবর থেকে নতুন বিলে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে এইচ১বি ভিসার সবকিছু। প্রতিবছর ১৯৫,০০০ ভিসা ইস্যুর প্রতিশ্রুতি রয়েছে এতে। একজন এইচ১বি ভিসাধারী তার কোম্পানী বদলাতে পারবে আবেদন করলেই। নতুন বিলে বলা হয়েছে আবেদন গ্রহণ হবার অপেক্ষায় পেশাজীবী কাউকে বসে থাকতে হবে না। এমন কি দ্বিতীয় বছরের এইচ১বি বাড়িয়ে নিতে চাইলে শুধু আবেদন করেই কাজ শুরু করা যাবে।

তবে গ্রীনকার্ড প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার কোন ব্যবস্থা এতে নেই। আরো নেই ভূয়া কোম্পানী সৃষ্টি করে অযোগ্য লোকদের ভিসা দিয়ে নিয়ে আসার প্রচলন রোধ করার অবস্থা। আবার আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের কথাই ধরা যায়। প্রতি বছর কনসালটিং কোম্পানীর পথ ধরে যে বিপুল সংখ্যক ভারতীয় নাগরিক এইচ১বি ভিসা নিয়ে আসছে, তারা বহুক্ষেত্রে নির্যাতিত। অল্প বেতনে মুখ বুজে তারা কাজ করে ঐ গ্রীন কার্ডের আশায়। অনেক সময় ভুয়া সার্টিফিকেটের জোরে আসে বলে প্রতিবাদ করার সাহসও তাদের থাকে না। নতুন বিলটি এই প্রতারণা বা নির্যাতন কোনটির জন্যই কোন বিধান দিতে পারেনি।

এবং আমরা

জর্জটাউন ইউনিভার্সিটির এক জরিপে দেখা যায়, বর্তমানে আমেরিকায় ৪২০,০০০ এইচ১বি কর্মী রয়েছে। নতুন বিল অনুযায়ী বছরে ১৯৫,০০০ জন করে আসতে থাকলে এ সংখ্যা বাড়বে অচিরেই। আমরা এ সুযোগ নিতে পারি। যোগ্য কর্মীর সংখ্যা দেশে কম নেই। অভাব শুধু উদ্যোগের, প্রতারণা না করেই বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশী জীবিকা নির্বাহের জন্য আমেরিকায় আসতে পারেন এইচ১বি ভিসার আওতায়। ❑

Subscription Form

নাসিমা সুলতানার অপ্রকাশিত কবিতা

সত্তর দশকের কবি নাসিমা সুলতানা ১৯৫৭ সালের ১৫ জানুয়ারি কুষ্টিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন ১৭ নভেম্বর ১৯৯৭ সালে। তিনি বাংলা সাহিত্যে পড়াশোনা শেষ করে সাংবাদিকতাকে পেশা হিসেবে নিয়েছিলেন। ১৯৮৫ সালে তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'মৃগয়ায় যুদ্ধের ঘোড়া' বের করে মুক্তধারা। এছাড়াও কবি সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলালের সাথে বেরিয়েছিল যৌথ গ্রন্থ 'তবু কেউ কারো নই'। মৃত্যুর পর গত বছর বের হয়েছে তাঁর রচনাসমগ্র-এর প্রথম খণ্ড। এই খণ্ডে কবিতার পাশাপাশি নয়টি অসাধারণ ছোট গল্প রয়েছে। বাংলা একাডেমী থেকে বের হতে যাচ্ছে নাসিমা সুলতানার জীবনী। 'পড়শী'তে তার অপ্রকাশিত কবিতা দুটি আহসানুল হাকিম টুটুলের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

অনন্ত তৃপ্তি চাই

আমি অনন্ত তৃপ্তি নিয়ে চলে যেতে চাই
তুমি শুধু একবার ভালবেসে নষ্ট করে দাও।
এ কেমন ভালবাসা
এ কেমন নষ্ট হওয়া এ কেমন তৃপ্তি আমি বুঝি না
বুঝি না বৈরাগ্যে ভালবাসা স্মৃতি হয়ে জ্বালা দ্যায় কিনা
নিষ্ঠুর ব্যাধির মতো বুকের চৌহদ্দি ঘিরে থাকে কিনা!
তুমি শুধু একবার ভালবেসে নষ্ট করে দাও।
তুমি শুধু একবার ওই রোখা ঝোঁকে বোকা চোখে
দশ আঙুলে দশটি নখে
আঁকড়ে ধরে আমার পতন, মদ-মাংস
বলো আমার জন্যে তুমি– তোমার মুক্তি এবং বন্দীত্ব!
আমি দু'দণ্ড শান্তি নিয়ে চলে যাবো চুপচাপ
আমার পাপের বিষাদে
আমার ঝড়বৃষ্টি, ভূমিকম্প, দাউ দাউ আগুনের মধ্যে
ভেঙে ভেঙে হয়ে যাবো একষট্টি হাজার
কোনও খেদ থাকবে না মনে–
জানি প্রেমাতুর পড়ে আছি নির্ঘুম
তুমি প্রেমাহত করে যাও
বৃষ্টিতে ছুঁড়ে দাও ক্রুশবিদ্ধ জিসাসের মতো
আমি অনন্ত তৃপ্তি নিয়ে চলে যাবো একা

৮ই ফেব্রুয়ারি ১৯৭৫

বীজ ও বাসনা

আজীবন প্রোথিত হবার বাসনা বীজের
ছোঁয়াচে রোগের মতো ছড়াচ্ছে গভীরে–
পাপী তুমি প্রত্যাখ্যান তুলে নাও
প্রত্যাখ্যানে ফিরে যাওয়া ভাল নয়
কখনোই কোনদিনই ভাল নয় ... ভাল নয়।
পেছনে আগ্নেয় দিন
হাড়ে হাড়ে বেগবান কঙ্কাল চেতনা
আর কী নিদারুণ আগুনের নদী
ভাসাচ্ছে নীল রোদ, ঘাস মাটি, হাঁসের আকাশ–
ঈশ্বরকে বলবো ভাবিনি– হ্যান্ডস আপ হও
ইদানীং লোডশেডিংয়ে পৃথিবীর কালো মুখ যথাস্থানে নেই
চেতনার লালরঙা শিরস্ত্রাণ আলুথালু অস্থির।
বলবো ভাবিনি
পরিপূর্ণ নিমজ্জনের অপেক্ষায় থাকা ভাল নয়
কখনোই কোনদিনই
ভাল নয় মিশরের মমি ভেবে
ট্র্যাফিকের শাদা হাত ছিঁড়ে ছুটে যাওয়া।

তাই মাঝে মাঝে প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে যান ঈশ্বর
পাপেরা ইন্দ্রিয় থেকে খুলে নেয় চৌখুপী কোট
অতএব অবিলম্বে প্রত্যাখ্যান তুলে নাও সখা
আমূল প্রোথিত হবার বাসনা বীজের
ছোঁয়াচে রোগের মতো ছড়াচ্ছে গভীরে।

২১শে মার্চ ১৯৭৫

উড়ান

কৌশিক সেন

রোজ বিকেল বেলা আমি একরকম তাড়াহুড়ো করেই রুগী দেখা সারি, কেন না আমার বান্ধবীটি অপেক্ষা করে থাকেন বাড়ি যাবার জন্য। ওয়ার্ডের একপাশ দিয়ে যে টানা থামওয়ালা বারান্দা তার দূরতম প্রান্তটিই আমাদের পছন্দ। যদিও বারান্দাটাকে র‍্যাঁদেভু হিসাবে ঠিক এক নম্বর বলা যায় না। যাদের নরক দর্শনের ইচছা আছে তারা আমাদের এই ফ্রি ওয়ার্ডের বারান্দাটি দেখলে নিশ্চয় 'ওয়া হমীনস্ত' বলে উঠবেন।

আজ দশ নম্বর বেডের জন্য আমার দেরি তো হয়েছেই, তায় আবার কথা ছিল ময়দানে কোন্ এক মেলায় যাবার সেটাও গেছি বেমালুম ভুলে। সন্ধ্যাটা ভাল কাটল না।

কটা সন্ধ্যাই আর ভাল কাটে এই হাউসস্টাফ জীবনে। কিন্তু এই দশ নম্বর বেডের ব্যাপারটা যেন একটা ভুতুড়ে নাটক, এটার পর ময়দানের মেলা দেখাটা কেমন যেন খাপছাড়া আর অপ্রাসঙ্গিক ঠেকছিল। খোলসা করে বলছি আপনারাই বিচার করে দেখুন।

বারান্দার সবচেয়ে বিচ্ছিরি কোণে যেখানে রোদ্দুর মাথায় থাক্, টিউবলাইটের ফ্যাকাশে আলোও পৌঁছয়না সেখানেই দশ নম্বর বেড। রাউন্ডের সময় ওটাকে আনমনে পাশ কাটিয়ে যাবার সুবিধা আছে বেশ। যাদের গঙ্গাযাত্রায় বিঘ্ন ঘটেছে তারাই সাধারনত ওখানে থাকে। অথাৎ যে বেখেয়াল রুগী সারেও না আবার চট্ করে মরে গিয়ে আমাদের কাজ হাল্কা করতেও চায় না সেই অবিবেচকদের ঠিকানা দশ নম্বর বেড। ওখানেই ছিল আট বছরের মনিরাম সাউ, যার মায়ের নাম কোনো এক দুর্বোধ্য কারণে লায়লা বিবি। ঠিকানা সোনাগাছি। বিদগ্ধ পাঠক জানেন ঠিকানার বাকি অংশটা এক্ষেত্রে অনাবশ্যক। যেমন অর্থহীন কোনো এক বর্ডারের গন্ডগ্রাম থেকে অল্পবয়স্ক মেয়ে ফুসলে এনে সোনাগাছিতে চালান দেবার পুরানো কিস্যা। ওসব বাদ দিয়ে সোজাসুজি বলা যাক্ আমরা একটি বেশ্যার ছেলের চিকিৎসা করছিলাম। ওয়ার্ড বয়রা অবশ্য ওই সংস্কৃত কথাটা পছন্দ করতো না। তারা মনিরামকে উল্লেখ করতো খানকির ছেলে বলে। কথাটা রাস্তার গালাগালি হলেও এ ক্ষেত্রে যে খাঁটি সত্য এ ব্যাপারটাই ওদের কাছে মজার মনে হতো।

এতক্ষণ অবধি তো পড়লেন বস্তাপচা চেনা গল্প। আমাদের মনেও বিশেষ কোনো ঔৎসুক্য জাগে নি, আমরা তো আর বিদগ্ধ সমাজতাত্বিক ছিলাম না। ছিলাম বিরক্ত হাউসস্টাফ।

নানা হাত ফেরত লায়লা বিবি যে কেন তার গর্ভ নষ্ট করলো না, কেনই বা মনিরামের নামের সঙ্গে তার তিন মাসের বাবার হিন্দু পদবীটি লটকে দিলো, এসব প্রশ্ন আমাদের অবান্তর ঠেকেছে।

সোনাগাছির গলিতে আট বছরের বাচ্চাদের জীবনটা কেমন হয় তা জানতেও আমাদের কোনো কৌতূহল হয়নি। মহিলাটিকে দেখতাম নোংরা ওড়নায় মুখ ঢেকে প্রায় সমস্তটা সকাল বসে থাকতো আর ওয়ার্ড বয়দের হাতে পায়ে ধরতো। অনুরোধ একটাই রাতের বেলাটা যেন ওরা ছেলেটাকে একটু দেখে। রাত্রিবেলাও কাজের শিফ্‌ট কিনা তাই যন্ত্রণায় কোকানো ছেলেটাকে ওয়ার্ড বয়দের দয়ার উপরে ফেলে যেতেই হতো ওকে। নিজের আট বছরের বাচ্চাটা যখন চোখের সামনে একটু একটু করে মারা যায় তখন সোনাগাছির রাত্রির কাজটা কেমন লাগতো ওর তা নিয়েও আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে নি কোনোদিন। ও ছিল ওয়ার্ডে একটা অস্বস্তিকর উপস্থিতি। আমরা ভদ্রলোকেরা এড়িয়ে চলতাম, অভদ্রলোকেরা ছোঁক ছোঁক করতো, নানারকম আভাষ ইঙ্গিত দিতেও ছাড়তো না। আশ্চর্য ব্যাপার ফ্রি বেডে মানুষ না কুকুর ভর্তি আছে তারই কেউ খোঁজ রাখেনা কিন্তু এই মেয়েটির ইতিহাস, ভূগোল থেকে শুরু করে যাবতীয় খবরাখবর জানা ছিল প্রত্যেকের। ওদিকে কৌতূহলের কোনো কমতি ছিলো না, চায়ের ভাড় হাতে রসালো আলোচনাও জমতো।

মনিরামের অসুখটা ছিল ঠিক ওর জীবনটার মতোই সৃষ্টিছাড়া। একটা বিদঘুটে টিউমার, নাকের ভিতরে গজায়, ডাক্তারি ভাষায় তার নাম ন্যামোফ্যারিনজিয়াল কারসিনোমা। ঠিকমতো চিকিৎসা না হলে টিউমারটা ক্রমাগত বাড়তে বাড়তে অবশেষে নাকের উপরের অংশটা ফাটিয়ে কতকটা ফুলকপির আকারে মুখের উপর জেগে ওঠে। চামড়ার আবরণ না থাকার জন্য টিস্যুগুলোতে জীবানু সংক্রমণ হয়। বিকট গন্ধ ছাড়ে। কাছে দাঁড়ানো ভার হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু এই ক্যানসার দেখতে যতো বীভৎসই হোক্‌ শরীরের অন্যান্য জায়গায় দেরিতে ছড়ায় কাজেই চট্‌ করে রুগী মারাও যায় না। দেখতে মারাত্মক বটে কিন্তু ন্যামোফ্যারিনজিয়াল সিত্র ঠিকমতন রেডিয়েশন এবং কেমোথেরাপি পেলে ঝপ্‌ করে কমেও যায়। আজকের যে কোনো সাধারণ ক্যান্সার সেন্টারে এই রুগীর সুস্থ হয়ে হাসতে হাসতে বাড়ি ফেরা উচিৎ।

অবশ্য মনিরাম সাউ ঠিক আজকের পৃথিবীর বাসিন্দা ছিল কিনা সেটা হলফ করে বলা মুশকিল। এই অবর্ণনীয় ফ্রি বেডে ওকে ভর্তি করতেই ওর মায়ের বহু কাঠখড় পোড়াতে হয়েছিল। সেই কাঠখড়ের ভাগ পেয়েছিল ওদিকের মাস্তান থেকে এদিকের ইউনিয়নের মুরুব্বিরা। এদিকে সপ্তাহ গড়িয়ে মাস হয় মনিরাম ভালোও হয় না, মরেও না, লায়লা বিবি ওকে ছুটি করিয়ে নিয়ে যেতেও চায় না, সে এক উৎকট সমস্যা। লায়লার বদ্ধমূল ধারণা যে ডাক্তার বাবুরা একটু দয়া করে "তেজী দাওয়াই আর সুই" দিলেই ওর ছেলে ভালো হয়ে যাবে। ও নিজে নষ্ট মেয়ে কিন্তু মনিরামের তো কোনো দোষ নেই, ওর বাবা নাকি ভালো ঘরের ছেলে, ও কেন মায়ের পাপের শাস্তি পায়! ডাক্তার বাবুরা যদি এইটা বিচার করে ছেলেটাকে ভালো করে দেন।

আপনারা ক্লান্ত হয়ে উঠেছেন, আসুন গল্পের শেষটা শুনিয়েই দিই। যেদিনের কথা দিয়ে শুরু করেছিলাম সেদিন লায়লা বিবি দাঁড়িয়েছিল বারান্দাটার সবচেয়ে নোংরা আর নিঃসঙ্গ কোণে। পেট কাপড়ে কি একটা গোলমতন জিনিস নিয়ে মেয়েটা যেন চট্‌ করে পালাতে চাইল আমায় দেখে। অল্প আলোতেও চোখে পড়লো পেট কাপড়ের পুঁটলিটা কেমন যেন নড়াচড়া করছে। জ্যান্ত জিনিস নাকি ? আমার হঠাৎ মনে হলো কারো সদ্যজাত বাচ্চা চুরি টুরি করে পালাচেছ নাতো মেয়েলোকটা ?

এক ধমকে ওকে দাঁড় করালাম। যে ভাষায় আমরা রুগী বা তাদের পরিবারের সঙ্গে বাতচিৎ চালাতাম, পরবর্তী কালে তা প্রাণের দায়ে ভুলতে হয়েছে। কিন্তু সে কথা থাক্‌। এটা কেন মনে পড়ে যে ওকে সোজাসুজি চোর বলতে আমার বাধেনি এবং আঁচলের তলায় নড়াচড়া করা জিনিসটা বার করবার হুকুম দিয়েছিলাম বাঘাটে গলায়।

তার পরে মাত্র কয়েকটা সেকেন্ড। হঠাৎ দেখি সাদা একটা লক্কা পায়রা ওর কাপড়ের আড়াল থেকে বেরিয়ে দুবার পট্‌ পট্‌ করে ডানা ঝাপটে বসলো গিয়ে বারান্দার জং ধরা রেলিংএ। কিছু বোঝার আগেই মিলিয়ে গেল সন্ধ্যার কলকাতার পাঁংশুটে আকাশে।

এবারে চোখ কপালে তোলার পালা আমার। এ সব আবার কী ? নেতারা শান্তির পায়রা ওড়াতেন, বাবু সাহেবরা ওড়াতেন ফুর্তির পায়রা, তাও তো অনেককাল আগে। এ মহিলা খামোখা ভর সন্ধ্যায় মেডিকেল কলেজের বারান্দা থেকে পায়রা ওড়ায় কেন ?

আর দুটো ধমক দিতে কারণটা বলল। ওদের নদীয়ার গ্রামে এক পীরসাহেবের দরবার আছে যেখানে দুনিয়ার তাবৎ মুশকিল আসান হয়ে থাকে। সেই পীরবাবাকে ও একবার বলতে শুনেছিল যে, বালাই দুর করার মোক্ষম উপায় হচেছ কোনো বদ্ধ জীবকে মুক্তি দেওয়া। আবার জীবের মধ্যে কবুতর হচেছ পয়লা নম্বর। আল্লাহর নাম নিয়ে কবুতর উড়িয়ে দিলে, রোগ বালাই তার সঙ্গে সঙ্গেই উড়ে পালাবে। ব্যাজার মুখে দাঁড়িয়ে ওর প্রলাপ শুনছি, হঠাৎ কানের পাশে ওয়ার্ড বয়ের ফিসফিসানি, "ডাক্তারবাবু এদিকে একবার আসেন, দশ নম্বরের এখন-তখন।"

ভয়ানক চমকে গেলাম। দশ নম্বর অ্যাসপিরেট করেছে, শ্বাস নিতে পারছেনা। ভেন্টিলেটর ছাড়া বাঁচানো অসম্ভব। তিন নম্বর দুনিয়ার দশ নম্বর বেডে ওসব ঝামেলা নেই, সুতরাং মনিরাম সাউ আমাদের হতবাক্‌ করে দিয়ে খুব চট্‌ পট্‌ মরে গেল। পীর বাবার কেরামতি আছে বৈকি। মনিরামের রোগ বালাইও পায়রার ডানায় ভর দিয়ে উধাও। ও যেন চুপটি করে ঘুমিয়ে রইল, পৃথিবীর অন্যান্য আট বছরের বাচ্চারা যেভাবে ঘুমায়।

না না আপনারা ভুল করছেন, বাড়ি যাবার পথে আমি একটু অন্যমনস্ক ছিলাম এই যা। পরদিন থেকে আবার সবকিছু ঠিকঠাক। দশ নম্বর বেডে অন্য কোনো গঙ্গাযাত্রী আস্তানা গেড়েছে। আমি ব্যস্ত থেকেছি বিলেত যাবার পরীক্ষা নিয়ে। কিন্তু অনেকদুর হাঁটার পর আজও পীরবাবার মোক্ষম দাওয়াইটার কথা মাঝে মাঝে আচমকা মনে পড়ে। তখনই বুঝি যে, ওই বারান্দা আর দশ নম্বর বেড থেকে বেশিদূর পালানো হয়ত এ জীবনে আর হয়ে উঠল না আমার। আমার নিজস্ব বালাই তার উড়ান খুঁজে পায় নি, সে আমার ঘাড়ে চেপেই বসে আছে। ❑

এহসান নাজিমের একগুচ্ছ কবিতা

সন্ন্যাসী হবো

আজ রাজ্যপাট চুকিয়ে দিয়ে সন্ন্যাসী হবো
ভেবোনা তোমার জন্যে
তোমার ঐ চোখের জন্যে নয়
যার ভাষা কেবল আমিই পড়তে জানি
তোমার ঐ কালো লম্বা চুলের জন্যে নয়
যার গন্ধ পেলে আমি দিশেহারা হই
তোমার ঐ ওষ্ঠের জন্যে নয়
যার স্পর্শ আমায় নতুন জন্ম দেয়
তোমার ঐ কপোলের জন্যে নয়
যাতে আমি খুঁজে পাই নিরাপদ আশ্রয়
তোমার চিবুকের জন্যে নয়
যার সুধা কেবল আমিই পান করি।
জানি তুমি রাঁধা, কিংবা আমি কৃষ্ণ
তবুও তোমার জন্যে আমার সন্ন্যাসী জীবন নয়;
আমি সন্ন্যাসী হবো
তোমারই কাছে লুকিয়ে থাকা
যার জন্যে আমার পরাজয়
আমার অহংকার
ভালবাসার জন্যে -
যার দ্বিতীয় সংস্করণ বা
পুনর্মুদ্রন এ পৃথিবীতে নয়।

তোমার জন্যে

গভীর রাতে ট্রেনের ঝনঝন শব্দ
মুখে হাত চাপা দিয়ে তোমার হাসি
আমি একদম আলাদা করতে পারিনা।
বৃষ্টির পর ধুয়ে যাওয়া বিশাল আকাশ
আমার দিকে তোমার হঠাৎ চাউনি
বুঝিনা কোনটা কার - তোমার না আকাশের?
এই এত প্রিয় তোমার জন্যে
অনুরণিত হোক বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সুরের ঝংকার
তোমাকে ঘিরে হোক পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ উৎসব
তোমার চলার পথে ফুটুক হরেক রকম পদ্ম
তোমার জন্য আলোড়িত হোক তামাম বিশ্ব
পৃথিবীর সবচে সুন্দর প্রজাপতি নাচুক তোমার চুলে
পলাশ ফুটুক মনে।

কবিতা আমার

একেবারে নতুন কড়কড়ে কবিতা লিখেছি
শুনবে তুমি?
তোমার দৃষ্টিকে উপেক্ষা করে আমি স্বার্থপরের মতো
আগাগোড়া আবৃত্তি করলাম আমার নতুন লেখা কবিতা
তারপর যখন তোমার দিকে চাইলাম
তোমার চোখভরা বিস্ময়
তার পিছনে অনন্ত ভালবাসা
কি অদ্ভুত তাল ও লয়ে চোখ থেকে ঠিকরে বের হচ্ছে
পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম কবিতা -
কি ভুলইনা করেছি আমি
আমার সামনে এমন জীবন্ত কবিতা রেখে
তোমাকেই শুনালাম আমার লেখা সবচেয়ে
অপাঠ্য, অশ্রাব্য, অস্পৃশ্য কবিতাখানি।

এহসান নাজিম বর্তমানে স্যান হোজে, ক্যালিফোর্নিয়া নিবাসী

নিউ ইয়র্কে বইমেলার দশবছর ও মুক্তধারা

ইকবাল হাসান

পরিচিত এক বাঙালীর বাড়িতে বেড়াতে গেলে অভিজ্ঞতাটি হয়। অনিবার্য অভিজ্ঞতা, সন্দেহ নেই! চমৎকার সাজানো গোছানো লিভিংরুম, লেদারের সোফা, সনির বিগস্ক্রীন টিভি, ভিসিডি, পুরু কাঁচের ডাইনিং টেবল আর আছে কাচের একটি আলমারি - শোকেস জাতীয়, ভেতরটা কাঁচের গ্লাস, থালা বাসন দিয়ে সাজানো , চাইনিজ ক্রোকারিজ। প্রবাসে ৭০-৮০ ভাগ বাঙালীর বসবার ঘরের চেহারাটি মোটামুটি একইরকম, এ বাড়ির থেকে কিছু আলাদা নয়। প্রবাস বলছি কেন ? দেশেও এই একই চিত্র!

আমি লিভিংরুমে বসিয়ে রেখে আমার স্ত্রী ভিতরে চলে গেলে আমি বসে বসে আসবাবপত্র দেখতে থাকি। সবকিছু আছে কিন্তু নেই শুধু বই।

হঠাৎ টের পাই ভিতর থেকে সমানে গোলাগুলির শব্দ আসছে! সহসা সশব্দে বেশ বিস্ফোরণ! হিন্দী ভাষায় চিৎকার করে হৈ চৈ! কিছুক্ষণের মধ্যেই পুলিশের গাড়ির পোঁ পা, পোঁ পা।

দুপুর বেলা আমার ঘোরের মতো হয়। কিন্তু পরক্ষণেই ভেসে আসা গানের সুর ও শব্দে এই ঘোর কেটে যায়। বুঝতে পারি, ভিতরের কোনো রুমে হিন্দী ছবি চলছে।

বাড়ির কর্তাটি মিষ্টি হেসে বললেন, ভিতরে ছেলেমেয়ে হিন্দী মুভি দেখছে, ওদের খুব প্রিয়, আমারও। আপনি দেখবেন ?

আমি মাথা নাড়ি। অর্থাৎ আমার উৎসাহ নেই। বই আছে আপনার ঘরে ?

ভদ্রলোক খুব বেশিদিন হয়নি এদেশে এসেছেন, প্রশ্ন শুনে কিঞ্চিৎ বিস্ময় নিয়ে বললেন, বই দিয়ে কী হবে ভাই ? বই-টই পড়ার সময় কোথায় ? যা একটু সময় পাই, ছেলে-মেয়ের সঙ্গে মুভি দেখি ডিভিডি'তে। দু'টো মাত্র ছুটির দিন কোন ফাঁকে চলে যায় টের পাই না।

ভদ্রলোক লেখাপড়া করেছেন, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স, অতএব অশিক্ষিত কিংবা নিম্নরুচির লোক বলে ভাবতে সাহস হলো না। বি. এ., এম. এ. পাশ দেয়া লোকেরা অশিক্ষিত হয় নাকি ?

মনে মনে ভাবলাম, ঘরে বই না রাখার কারণ হিসেবে সময়হীনতা কোনো যুক্তি নয়। আসল কথা ইচ্ছের অভাব। সবকিছু এই যেমন, বাজারঘাট করা, চাকুরি ব্যবসা করা, প্রাত্যহিক কাজকর্ম করা, সেক্স করা সব কিছুর জন্য সময় হয়, শুধু বই পড়ার জন্য সময় নেই। এটা কি বিশ্বাসযোগ্য কোনো যুক্তি হল

তবে ভিন্ন চিত্রও দেখেছি।

আমার দেড়যুগের প্রবাস জীবনে এমন দু'চারজন মা বাবাকে জানি যারা নিজেরা বিদেশে বসেও বাংলা বই পড়েন, সংগ্রহ করেন। ছেলে-মেয়েদের বাংলা শেখানোর জন্য প্রাণপন চেষ্টা করেন, বাংলা বই পড়ান। ছেলে -মেয়েরা পড়তে না পারলে কিংবা পড়তে না চাইলে পড়ে শোনান সত্যজিত রায়ের ভূতের গল্প কিংবা শীবরাম চক্রবর্তীর হাসির গল্প। দেশে বেড়াতে গেলে ফেরার সময় প্রয়োজনীয় জিনিস পত্রের সঙ্গে পাঁচ-দশখানা বইও নিয়ে আসেন। তবে এমন পরিবারের সংখ্যা হাতে গোনার মতো - খুব বেশি নয়।

প্রবাসে অধিকাংশ মা-ই মনে মনে চান না যে, তাদের ছেলেমেয়েরা বাংলায় কথা বলুক, বাংলা পড়ুক। ইংরেজির দেশে থাকবে, তারা কেন বাংলা পড়বে, বাংলা বলবে ? তারা ইংরেজি পড়বে, বলবে এটাই তো স্বাভাবিক!

একবার আমাদের এ্যাপার্টমেন্ট ভবনের এলিভেটরে সদ্য দেশ থেকে ইমিগ্রেশন নিয়ে আসা এক বাঙালী মহিলার সঙ্গে দেখা, তিনি তাঁর দশ বছরের কন্যাটিকে দেখিয়ে বললেন, জানেন এই কদিনেই ও বাংলা একদম ভুলে গেছে, বলতেই চায় না। সারাক্ষণ ইংরেজি বলে। শুনে আমার খুব রাগ হলো। কিন্তু ভেতরের রাগটা তো আর মুখে প্রকাশ করতে পারি না। মহিলার দিকে তাকিয়ে বিনীত হেসে শুধু বললাম, ওর বাবা এদেশী ক্যানেডিয়ান বুঝি?

ভদ্রমহিলা রেগে আমার সঙ্গে কথা বলেন নি সাড়ে তিন বছর।

২.

তবে হ্যাঁ, একটা সমস্যা তো ছিলোই। বিদেশে বাংলা বইয়ের অভাব, দুস্প্রাপ্যতা। বইয়ের কোনো দোকান ছিল না যেখান থেকে বই কেনা

যায়। জাতি হিসেবে আমরা পড়ুয়া জাতি না হলেও প্রবাসে বাংলা বই হাতের কাছে না থাকায় আমাদের পাঠ অভ্যাস যেটুকু ছিলো তাও ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যায়।

ঠিক এমন একটি সময়ে প্রবাসে বাঙালিদের পাঠ অভ্যাস তৈরি এবং প্রবাসে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বাংলা বইয়ের আমাদানি ও বিক্রয়ের সুচনা করে 'মুক্তধারা'। বাঙালি সমাজে আমাদের সাহিত্য সংস্কৃতি কৃষ্টি ও ইতিহাস প্রচার ও প্রসারে প্রতিষ্ঠানটি একটি গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা পালনে এগিয়ে আসে।

তরুণ সাংস্কৃতিক কর্মী বিশ্বজিত সাহার সম্পূর্ণ একক, আন্তরিক প্রচেষ্টায় 'মুক্তধারা' ১৯৯২ সালে বই মেলার যে উদ্দ্যোগ নেয়-আজ তা নিউইয়র্কে একটি অনন্য উৎসবের পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে।

আমার মনে আছে ১৯৯২ সালে বইমেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশ্বজিতের আমন্ত্রণে উপস্থিত ছিলাম। উদ্বোধন করেছিলেন খ্যাতনামা গল্পকার জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত। আমি নিজে কোনো বিখ্যাত ব্যক্তি নই, আমি গিয়েছিলাম খ্যাতনামাদের দেখতে এবং তাঁদের দুএকজনের লিভিং রুমের এককোণে বসে তাঁদের নৈশকালীন আড্ডা উপভোগ করতে। মনে পড়ে পরের বছর কবি শহীদ কাদরী এসেছিলেন বস্টন থেকে, আমি টরন্টো থেকে। আমাদের তুমুল আড্ডা হয়েছিলো সেবার। ১৯৯৫ সালে যে বছর বইমেলার উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট পুষ্টিবিজ্ঞানী ও গদ্যশিল্পী পূরবী বসু - সেবছরও গিয়েছিলাম। ১৯৯৬ সালে প্রবীন সাংবাদিক, কলামিস্ট আব্দুল গাফ্‌ফার চৌধুরী যেবছর বইমেলা উদ্বোধন করেছিলেন সে বছর (কিংবা তার আগের অথবা পরের বছর, মনে নেই) কবিতা পাঠের অনুষ্ঠানটির দায়িত্ব আমাকে দেয়া হয় (অবশ্য আমাদের পরমা সুন্দরী কবি বন্ধু জাহানারা আখতার অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা করেন)।

১৯৯২ সাল থেকে আজ পর্যন্ত প্রতি বছর নিউইয়র্কে বইমেলা আয়োজিত হচ্ছে, মাত্র দু'তিনবার যেতে পারিনি নানা কারণে। এবার বিশ্বজিত ২০০১ সালের বইমেলার দশবছর পূর্তিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য বড় ধরনের উদ্যোগ নিয়েছেন। এবার দুই বাংলার জনপ্রিয় ৪জন লেখক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় , সমরেশ মজুমদার, হুমায়ুন আহমেদ ও ইমদাদুল হক মিলন এবং ওয়াশিংটন থেকে দিলারা হাশেম যোগ দিচেছন। টেলিফোন আমন্ত্রণের পাশাপাশি আমার নাম দেখলাম কাগজে!

১৯৯২ সালে আনুষ্ঠানিক ভাবে বইমেলা শুরু হলেও ১৯৯১ সালে বিশ্বজিত সাহা তাঁর উডসাইডের বাসার ক্ষুদ্র পরিসর থেকে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বই বিক্রয় শুরু করেন। 'মুক্তধারা' বাণিজ্যিক নামটির আড়ালে রয়েছে একটি মানুষের বইয়ের প্রতি সীমাহীন আগ্রহ, বাংলা ভাষা সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসা, আন্তরিক নিষ্ঠা, সততা এবং অমানুষিক পরিশ্রম। যার ফলশ্রুতিতে নিউইয়র্কে গড়ে উঠেছে রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ও জীবনানন্দের ছবিসহ একটি বিশাল নিয়ন সাইন শোভিত ১৪০০ স্কয়ারফুট আয়তনের 'মুক্তধারা'র (জ্যাকসন হাইটস) নিজস্ব বিক্রয় কেন্দ্রটি।

মুক্তধারা এবং বিশ্বজিত আজ উত্তর আমেরিকার দু'টি বহুল পরিচিতি নাম। উত্তর আমেরিকার যে কোনো শহরে বড় ধরনের কোনো অনুষ্ঠান হলেই সেখানে মুক্তধারা স্টলের উপস্থিতি অনিবার্য, গত ১০ বছরে মুক্তধারা আমেরিকার (কানাডাসহ) বিভিন্ন শহরে প্রায় ২০০ বইমেলার আয়োজন করে। এটা নিঃসন্দেহে যে কোনো প্রতিষ্ঠানের জন্য একটা বড় ধরনের সাফল্য।

এখন মুক্তধারার বদৌলতে প্রবাসী বাঙালীরা খুব সহজেই পেয়ে যাচ্ছেন তাদের প্রিয় লেখকদের বই। হুমায়ুন আহমেদ, ইমদাদুল হক মিলন, মইনুল আহসান সাবের, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সমরেশ মজুমদার তরুণ সমাজের প্রিয় লেখকদের বই এখন তরুণদের হাতের কাছেই। পাশাপাশি দেবেন রায়, শীর্ষেন্দু, জ্যোতি বসু, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় আর আমাদের শামসুর রাহমান, সৈয়দ হক, আল মাহমুদ, রফিক আজাদ, সিকদার আমিনুল হক, নির্মলেন্দু গুন, মহাদেব সাহার গ্রন্থ পাওয়া যাচেছ এই দূর প্রবাসে। আছেন সন্দীপন, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, আবুল বাশার, বদরুদ্দিন ওমর, আবদুল গাফফার চৌধুরী আর তসলিমা নাসরিন।

এতসব বড় লেখক কবিদের পাশে আমিও গত বছর নিউইয়র্ক এসে আমার ৫টি বইয়ের ২৫ খানা কপি বিক্রির জন্য বিশ্বজিতের মুক্তধারাকে গছিয়ে দিয়ে আসি। আজ প্রবাসের ঘরে ঘরেই শুধু নয়, পশ্চিম বাংলা এবং বাংলাদেশেও হিন্দি ছবির প্রচন্ড দাপট। হিন্দি ছবি এবং হিন্দি গান ও সংস্কৃতির ব্যাপক জনপ্রিয়তা আমাদের দুই বাংলার ঐতিহ্যবাহী বাঙালি সংস্কৃতির জন্য হুমকি স্বরূপ। গত আড্ডায় আমাদের সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অসাম্প্রদায়িক লেখক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় দুঃখ করে বলেছিলেন, ... আমাদের পশ্চিম বাংলায়ও হিন্দী সংস্কৃতির ব্যাপক অনুপ্রবেশ ঘটেছে। বাংলা যে ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে টের পাচ্ছি।

মুক্তধারা প্রবাসে বাংলা বইয়ের পাশাপাশি বাংলা নাটক এবং বাংলা ছবি প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেছে। আজ বাংলা নাটক প্রবাসে এতোই জনপ্রিয় যে হিন্দি ও উর্দু ভাসাভাসি দোকানগুলো বাঙালীদের আকৃষ্ট করার জন্য বাংলা নাটক রাখতে বাধ্য হয়েছে।

এছাড়া এপর্যন্ত বিশ্বজিত প্রবাসে বিভিন্ন শিল্পীর কন্ঠে গাওয়া বাংলা গানের ১০টি সিডি প্রকাশ করেছেন।

প্রবাসে বিজাতীয় সংস্কৃতির দাপটে আমরা প্রায় ভুলতে বসেছিলাম যে, আমরা জাতিগতভাবে বাঙালী। বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। বিশ্বজিত এবং 'মুক্তধারা' প্রতিবছর বইমেলার মাধ্যমে যেন আমাদের সে কথাটি স্মরণ করিয়ে দিতে চায়। ❑

টরন্টো, কানাডা।

জেগেছে বাঙালীর ঘরে ঘরে
একি মাতম দোলা
লেগেছে সুরের-ই তালে তালে
হৃদয় মাতম দোলা

মেলায় যাইরে-
বাসন্তী রঙ শাড়ী পড়ে
ললনারা হেঁটে যায়-

ই-মেলা

http://e-Mela.com

আমাদের ঠিকানা

TAJ TRAVEL INTERNATIONAL

Corporate ❑ Apex ❑ Excursion ❑ Domestic ❑ International ❑ Cruise ❑ Packages ❑ Hotel & Rent a Car etc

আমরা আমেরিকা থেকে বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান এবং বিশ্বের যে কোন শহরে ভ্রমণের জন্য Singapore / Thai air / Malaysian / Korean / Eva air / Cathay Pacific + Dragon / United / Biman / Gulf air / Emirates / British air এবং আর সকল বিমানের নির্ভরযোগ্য টিকিটের ব্যবস্থা সাথে, পবিত্র হজ্জ ও ওমরাহ্ সমাপনের জন্য শুধু টিকিট অথবা পুরো প্যাকেজ তৈরী করা এবং আমেরিকার যে কোন শহর থেকে শহরে কম সময়ের নোটিশে কম দামে টিকিট করে দিতে সক্ষম। আমরা বে-এরিয়াতে আপনাদের ভ্রমণে সবরকম সহায়তায় একমাত্র বাংলাদেশী বিশ্বস্থ ও নির্ভরশীল ট্র্যাভেল এজেন্ট হিসাবে গত ১১ বছর ধরে পরিচিত।

“Experience Travel with a Difference”

Mon - Fri from 9.30am to 7.30 pm & Sat 11.00am to 1.00pm

Please contact for the LOWEST Fares

Mohammad (Mowla) **Baksh**
E-mail : Tajtravelint@hotmail.com

Ph : 510-770-0422
Fax : 510-770-0965

41994 Miranda Street, Fremont, CA 94539

ভ্যাঙ্কুভারের চিঠি

জীবন ও জীবিকার তাগিদে আমরা বাংলাদেশ থেকে অনেক দূরে প্রশান্ত মহাসাগরের কূলে এই ভ্যাঙ্কুভারে বসতি স্থাপন করেছি। ব্রিটিশ এক্সপ্লোরার ক্যাপ্টেন জর্জ ভ্যাঙ্কুভার আজকের কানাডার ওয়েস্ট কোস্টে প্রথম পদার্পন করেছিলেন ১৭৯২ সালে। তাঁর নাম অনুসারেই এ মাটির নাম হয়েছে ভ্যাঙ্কুভার। কবে, কখন প্রথম বাঙালী এখানে এসেছিলেন, আমার জানা নাই। তবে পৃথিবীর অন্যান্য দেশ থেকে আসা বহিরাগতদের মতো বাংলাদেশ থেকে আসা অভিবাসীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় চার হাজারের মতো।

বিদেশ বিভূঁইয়ে নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও আমরা ভুলতে পারি না আমাদের দেশের সেই ফেলে আসা দিনগুলো। বারবার সচেষ্ট হই আমাদের সংস্কৃতি ও ভাষাকে ধরে রাখতে। সেই আবেগ আর অনুভূতি থেকেই আমরা প্রায় দু'বছর আগে শুরু করেছিলাম সাপ্তাহিক বাংলা টেলিজার্নাল 'টেলিবাংলা'। টেলিবাংলা ইতিমধ্যেই টেলিফোনে স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে সমগ্র ভ্যাঙ্কুভারের বাংলাদেশীদের মাঝে এক অদৃশ্য সংযোগ। এই টেলিবাংলার মাধ্যমেই এখানকার বাঙালীরা শোনেন দেশের সর্বশেষ খবর, শোনেন সংবাদ প্রতিবেদন, বাংলা গান ও আবৃত্তি।

প্রবাসে বসে বাংলা ভাষা বা সংস্কৃতিকে ধরে রাখা খুব সহজ নয়। যারা এ কঠিন কাজটিতে নিবেদিত, নিঃস্বার্থভাবে কাজ করে যাচ্ছেন, সেটা নেহায়েৎ দেশের প্রতি, দেশের মানুষের প্রতি অঙ্গীকারের ফলশ্রুতিতে। প্রবাসে বসবাসরত বাঙালী অভিবাসী যারা বাংলা শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখছেন, তাদের জন্য ভ্যাঙ্কুভারস্থ টেলিজার্নাল টেলিবাংলা Pacific Excellence of Performances সম্মাননা প্রবর্তন করেছে। ২০০১ সালে প্রথমবারের মত এ সম্মাননার জন্য যারা মনোনীত হয়েছেন, তাঁরা হলেন : লন্ডনপ্রবাসী সাংবাদিক, কলামিস্ট জনাব আব্দুল গাফ্ফার চৌধুরী; অটোয়া প্রবাসী এক্টিভিস্ট, সাংবাদিক জনাব ফারুখ ফয়সাল; এবং ভ্যাঙ্কুভারস্থ জনাব রফিকুল ইসলাম ও জনাব আব্দুস সালাম, আন্ত র্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপনের জন্য।

গত ১৮ই মার্চ রোববার ভ্যাঙ্কুভার শহরের পোলিশ কম্যুনিটি সেন্টারে বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস ও বঙ্গবন্ধুর জন্মদিবস উপলক্ষে আলোচনা সভার আয়োজন করেছিল বঙ্গবন্ধু পরিষদ অব ব্রিটিশ কলাম্বিয়া। অনুষ্ঠানটিতে হল ভর্তি প্রচুর লোকের সমাগম হয়েছিল। ভ্যাঙ্কুভারের একটি জিনিষ খুবই লক্ষ্যণীয়, সেটা হচ্ছে বাঙালীদের মধ্যকার সমঝোতা। এখানে বাঙালী কম্যুনিটির যে কোন সমাবেশেই জনমত নির্বিশেষে সবদলের মানুষই সব অনুষ্ঠানে আসা যাওয়া করে। সেদিনের সে অনুষ্ঠান বঙ্গবন্ধু পরিষদ আয়োজন করলেও গ্রেটার ভ্যাঙ্কুভার বাংলাদেশ এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ কালচারাল এসোসিয়েশন এবং অন্যান্য দলের লোকজন সহ প্রচুর দর্শক সমাগম হয়েছিল। জনাব গাফ্ফার চৌধুরী ছিলেন অনুষ্ঠানের প্রধান বক্তা।

সরকারী উদ্যোগে নয় বরং প্রবাসে থেকে দেশপ্রেমিক দুইজন ভ্যাঙ্কুভারবাসীর উদ্যোগেই বাংলাভাষা দিবস আজ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের মর্যাদায় অভিষিক্ত। মহান শহীদ দিবস, বায়ান্নোর একুশে ফেব্রুয়ারীকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণায় অনন্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ জনাব রফিকুল ইসলাম ও জনাব আব্দুস সালাম-এর হাতে সনদ তুলে দেওয়া হয়। অটোয়া প্রবাসী এক্টিভিস্ট, সাংবাদিক জনাব ফারুখ ফয়সালকে প্রবাসে বাংলা সাংবাদিকতার ধারাকে অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখার জন্য এ সম্মাননা প্রদান করা হয়।

গত পহেলা এপ্রিল রোববার বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে পোলিশ কম্যুনিটি সেন্টারে বাংলাদেশ কালচারাল এসোসিয়েশন অব বিসি আয়োজন করেছিল আর এক মনোজ্ঞ বিচিত্রানুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে আরও ছিল র‍্যাফেল ড্র ও ভোজের আয়োজন। প্রচুর দর্শক শ্রোতার উপস্থিতিতে এ অনুষ্ঠানটি যথাসময়ে শেষ হয়।

গত ২৯শে এপ্রিল ভ্যাঙ্কুভারবাসীরা আয়োজন করেছিল বৈশাখী মেলার। বার্নবীর ইঞ্জিনিয়ারিং অডিটোরিয়ামে সারাদিনভর অনুষ্ঠিত হলো মেলা। আয়োজনের দায়িত্বে ছিলেন রুশি মোহসীন। ভ্যাঙ্কুভারের বাংলাদেশীরা বৈশাখী মেলা প্রথমবারের মতো জাঁকজমকভাবে আয়োজন করেছিল ১৯৯৯ সালে। গতবার মেলা হয় নাই। এবারের মেলায় এসেছিলেন সর্বস্তরের মানুষ। পরিবার পরিজন নিয়ে সবাই এসছিলেন বৈশাখী মেলার নির্মল আনন্দ উপভোগের জন্য। নববর্ষের সে মেলা রূপ নিয়েছিল সর্বজনীন এক উৎসবের প্রাণকেন্দ্র হিসেবে।

সকাল দশটা থেকেই শুরু হয় মেলার সব স্টল সাজানো। কুড়িটির মতো ছোট-বড় নানা ধরনের স্টল ছিল সেখানে। স্থানীয় গোষ্ঠীগুলো যেমন বাংলাদেশ এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ কালচারাল এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ সেন্টার, বঙ্গবন্ধু পরিষদ, জিয়া পরিষদ, টেলিবাংলা, বাংলা স্কুল ইত্যাদি ছাড়া খাবার-দাবারের প্রতিটি স্টলই ছিল ব্যক্তিগত উদ্যোগে নেয়া। প্রতিটি স্টলে স্তূপাকারে সাজানো হয়েছিল দেশীয় কায়দায় তৈরী পিঠা, মিষ্টি, কুলফি, সমুচা, প্যাটিস, হালুয়া, ঝালমুড়ি, চানাচুর, শুটকি ভর্তা, পান্তা-ভাত, চটপটি, ফুচকা, শাহী হাশিম, খিলিপান এবং আরো অনেক কিছু।

স্টলে স্টলে খাওয়া-দাওয়া আর আড্ডার সাথে তাল মিলিয়ে রমনার বটমূলীয় কায়দায় সারাদিনভর চলেছে বিচিত্রানুষ্ঠান। এখানকার স্থানীয় বাংলা স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা তাদের কচিমুখে কাঁচা অঙ্গভঙ্গিতে পরিবেশন করে বাংলা ছড়া-কবিতা, গান, নাটিকা - এসব আয়োজন সৃষ্টি করেছিল সেই ফেলে আসা এক নস্টালজিক মুহূর্ত। ছোট ছোট বালক-বালিকারা উপস্থিত দর্শকদের ক্ষণিকের জন্য হলেও নিয়ে যেতে পেরেছিল বাংলার পল্লীমায়ের কাছে।

বাংলা স্কুলের কচিকাঁচাদের পর্ব শেষ হলে শুরু হয় বড়দের পালা। সেখানে সঙ্গীত পরিবেশনে অংশগ্রহণ করেন আমেনিনা চৌধুরী লুইজা, সামিয়া রহমান রীন, সুভাস দাস, মাইকেল মিত্র, হ্যাপি দাস, জাস্টিন, মিষ্টি, বুলি

ইসলাম ও রুশি মোহসীন। কবিতা আবৃত্তিতে ছিলেন নাহিদ মজুমদার, মিষ্টি ও আমেনিনা। নৃত্য পরিবেশনে ছিল রনিতা ও পুনম। স্টেজের তত্ত্বাবধানে ছিলেন সৈয়দ নিজাম উদ্দীন ও সাজিদুল ইসলাম স্বপন।

মেলায় আগত বিদেশী অতিথিদের কাছে বাংলার আবহমান এই সংস্কৃতিকে তুলে ধরার জন্য একসময়ে মঞ্চে আসেন অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা সৈয়দ মোহসীন। অতিথিদের মধ্যে ছিলেন কানাডার রাজনৈতিক মূলধারার কিছু ব্যক্তিত্ব এবং স্থানীয় সংবাদপত্রের সাংবাদিকরা। সৈয়দ মোহসীন তাঁর সাবলীল উপস্থাপনার জন্য প্রশংসার দাবী রাখেন।

এরপরের পর্ব ছিল নাটক। নাটক শুরু করার আগে মঞ্চে আমন্ত্রণ জানানো হয় বাংলাদেশ থেকে আগত বিশিষ্ট টিভি নাট্যব্যক্তিত্ব কাজী উৎপল-কে। তাঁর বক্তব্যের পরই শুরু হয় নাটক "জনৈক ঈমান আলী'। নাটকের মূল চরিত্র ঈমান আলীর ভূমিকায় কাজী পিয়ালের অভিনয় ছিল অনবদ্য। মৌলভীর চরিত্রে সৈয়দ মোহসীন এবং ব্রাহ্মনের চরিত্রে সবুজ মজুমদার দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। অন্যান্য চরিত্র চিত্রনে ছিলেন নাভিন মজুমদার, রেজাউল করিম, মুনির, মীজানুর রহমান কবীর, সামিয়া রহমান এবং মীজানুর রহমান মজুমদার। মঞ্চের দুর্বল ও অপরিমিত সাউন্ড সিস্টেমের কথা বাদ দিলে পুরো নাটকটি ছিল সুন্দর ও প্রশংসনীয়।

ভ্যাঙ্কুভারস্থ টেলিজার্নাল - টেলিবাংলা (604-543-7750) আয়োজন করেছিল র‍্যাফেল ড্র। পুরস্কার ছিল মাইক্রোওয়েভ ওভেন। ড্র পরিচালনা করেন জন আমীন। পুরস্কার বিজয়ী আলী আজম খানকে পুরস্কার প্রদান করেন কাজী উৎপল।

আমীনুল ইসলাম মওলা

নীলিমায় বৈশাখ

স্যান হোজেতে বাবা'র সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা

সূর্যোদয়ে তুমি, সূর্যাস্তেও তুমি
ও আমার বাংলাদেশ প্রিয় জন্মভূমি ...

গানের এই কথাগুলি দিয়েই শুরু হয়েছিল অনুষ্ঠানটি। হ্যাঁ-আমরা আমাদের প্রিয় জন্মভূমির মায়া ছেড়ে সুন্দর আমেরিকাতে প্রবাস জীবন বেছে নিয়েছি। দূরত্ব ও কর্মব্যস্ততার জন্য আমরা বাঙালী ভাই-বোন চতুর্দিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছি। কিন্তু প্রবাসী হয়েও আমরা আমাদের বৈচিত্র্যপূর্ণ সংস্কৃতি থেকে মোটেও দূরে নই। ক্যালিফোর্নিয়ার প্রশান্ত মহাসাগরের তীরবর্তী এলাকার বাঙালীদের নিয়ে গঠিত Bay Area Bangladesh Association (BABA)এখানকার বাঙালীদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে একত্রিত হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে। সেই BABA থেকে আয়োজিত 'নীলিমায় বৈশাখ' নামে চমৎকার সুরলহরী আমাদের উপহার দিয়েছে একরাশ আনন্দ। বিজ্ঞানের কল্যাণে পৃথিবী আজ অনেক ছোট হয়েছে। ফলে এক দেশের শিল্প-সংস্কৃতি এখন অন্য দেশে অনায়াসে প্রবেশ করে। আমাদের সংস্কৃতিতেও এখন নতুন নতুন পাশ্চাত্য বাদ্যযন্ত্রের প্রবেশ ঘটেছে। ফলে সঙ্গীতের সুরলহরীতে এসেছে নতুনত্ব। বৈশাখের প্রচন্ড খররোদে এক পশলা শীতল বাতাস যেমন মন প্রাণ জুড়িয়ে দেয় ঠিক তেমনি 'নীলিমায় বৈশাখ'এর সুরের অঞ্জলী আমাদের হৃদয়ে তরঙ্গের ঢেউ তুলে, মিটিয়েছে পিয়াস। 'নীলিমায় বৈশাখ' অনুষ্ঠানের আমন্ত্রিত শিল্পীরা ছিলেন কুমার বিশ্বজিৎ ও তারিন। কুমার বিশ্বজিৎকে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেবার কিছু নেই। তিনি ২০ বছর ধরে রেডিও, টেলিভিশন ও সিনেমাতে কণ্ঠ প্রদান করছেন। তিনি বাংলা আধুনিক গানের উন্নতি বিকাশে যথেষ্ট অবদান রেখেছেন।

নৃত্য শিল্পী হিসেবে তারিনের জীবন শুরু। অভিনয় ও মডেলিং করেন শখের বশে। এই দুই শিল্পীর সৃষ্ট সুনিপুণ কারুকাজে 'নীলিমায় বৈশাখ'এর বৈচিত্র্যপূর্ণ অনুষ্ঠানটি ক্ষণিকের জন্য দেশের সেই ফেলে আসা স্মৃতির মূর্চ্ছনায় হারিয়ে গিয়েছিল। Fremont স্কুলে অনুষ্ঠিত 'নীলিমায় বৈশাখ'এ কুমার বিশ্বজিৎ প্রথমে দর্শকের সামনে উপস্থিত হন পাগল করা মন মাতানো সব গান নিয়ে। এ যেন মূর্ছিত বীণার ঝঙ্কারে ক্ষণকালের জন্য স্তব্ধ হয়ে যায় চতুর্দিক। জীবন যাপনে যত ক্লান্তি থাক হঠাৎ করেই যেন দর্শকের হৃদয় স্বপ্নের মত জ্বলে উঠে। সকল দর্শক বিশ্বজিতের পুরোনো সেই সব গানের মধ্যে স্বভাবসুলভ ভাবেই যেন দেশের নষ্টালজিয়ায় আক্রান্ত হয়। বিরতিহীন গানে বৈচিত্র্য আনতে তারিনের নৃত্য যেন সেই দাবীটি রাখে। তারিনের নূপুরের নিক্কন ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে ওঠে যেন অডিটরিয়ামটি। এ যেন ঠিক পূর্ণিমা রাত্রি, উজ্জ্বল হয়ে ওঠে যেন জলজ্যোৎস্নাটি। পরমুহূর্তে আবারো শুরু হয় কুমার বিশ্বজিতের মন মাতানো গান, রাতের আঁধার এসে আমাদের পৃথিবীকে হঠাৎ-ই যেন ঢেকে দিয়ে যায়। ঘড়ির কাটা এগুতে থাকে। নিদ্রাহারা রাতের পাখিরা যেন ভিড় জমিয়েছে এই Fremont স্কুলে। মন্থর হয়ে আসে সময়। তবুও দর্শকের হৃদয় যেন অতৃপ্তই থেকে যায়। সারাটি রাত ধরে গানের জলসা চলবে এমনও আবদার করেন অনেকে।

সকল প্রতাপের বুঝি হল অবসান, চাঁদ চলে গেল দিগন্তের ওপারে ক্লান্ত পাখির মত সকল দর্শক হৃদয়ে কুমার বিশ্বজিতের গান নিয়ে ফিরে যায় যে যার নীড়ে। পিছনে পড়ে থাকে Fremont School এর মিলনায়তন। বিদায় নীলিমায় বৈশাখ...।

আন্দালীব ফেরদৌস তনামী

৬ষ্ঠ উত্তর আমেরিকা
বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন
লস এঞ্জেলেস ২০০১

গত মেমোরিয়াল ডে উইকেন্ডে লস এঞ্জেলেসে হয়ে গেল ৬ষ্ঠ উত্তর আমেরিকা বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন। দু'দিনব্যাপী (২৬শে ও ২৭শে মে)এ সম্মেলনের স্থান ছিল লস এঞ্জেলেস শহরের কেন্দ্রে অবস্থিত শ্যাটো রিক্রিয়েশন সেন্টার। সেন্টারের মূল মঞ্চে চলেছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, আলোচনা, সেমিনার, প্রদর্শনী এবং তার পাশাপাশি সেন্টারের উন্মুক্ত আঙ্গিনায় বসেছিল রকমারী আয়োজনের মেলা। ভেতর-বাইরের আয়োজন-অনুষ্ঠান আর আড্ডার সংমিশ্রনে উৎসবে অংশগ্রহণকারী অতিথিবৃন্দ থেকে শুরু করে লস এঞ্জেলেসের বাইরের বিভিন্ন শহর থেকে আসা অংশগ্রহণকারীরা এবং স্থানীয় দর্শক-শ্রোতাবৃন্দ - সবাই যেন অবগাহন করেছেন বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রবাসী এ সরোবরে।

গোড়ার কথা

Bangla Literature and Culture Inc., Chicago, Illinois - এর উদ্যোগে ও এর বিশেষ মূলনীতির ভিত্তিতে ১৯৯৩ সালে প্রথমবারের মত এবং ১৯৯৭ সাল থেকে নিয়মিতভাবে প্রতি বছর উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন শহরে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। এর আগে শিকাগো (১৯৯৩, ১৯৯৭, ২০০০), নিউ ইয়র্ক (১৯৯৮) ও ডালাস (১৯৯৯) শহরে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। দুই বাংলার ও উত্তর আমেরিকার অভিবাসী বাঙালী গুণী-গবেষক-সাহিত্যিক-শিল্পীর অংশগ্রহণের মাধ্যমে ও অভিবাসী বাঙালী সাহিত্য-সংস্কৃতি অনুরাগীদের বিশাল সমাবেশে অনুষ্ঠিত প্রতিটি সম্মেলনই সার্থকতা লাভ করেছে এবং সর্বমহলে প্রশংসা অর্জন করেছে।

এবারের সম্মেলন লস এঞ্জেলেসে

৬ষ্ঠ সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হলো লস এঞ্জেলেস শহরে। সম্মেলনের ঐতিহ্য অনুযায়ী এবারেও দুই বাংলা থেকে অতিথিরা এসেছিলেন, আমন্ত্রিত অতিথিরা এসেছিলেন উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন শহর থেকেও। বাংলাদেশ থেকে এসেছিলেন জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক ইমদাদুল হক মিলন এবং পশ্চিমবঙ্গ থেকে বাংলা সাহিত্যের সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। প্রবাসী দুই সাহিত্যিক ঔপন্যাসিক দিলারা হাশেম (ওয়াশিংটন) এবং কবি সুরাইয়া খানম (এ্যারিজোনা) যোগ দিয়েছিলেন এ সম্মেলনে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

সম্মেলন শুরু হবার কথা ছিল শনিবার সকালবেলা। কিন্তু অনুষ্ঠান শুরু হতে বেশ বিলম্ব হয়। উপরন্তু দুপুরের দিকে দর্শক উপস্থিতিও ছিলো হতাশাব্যাঞ্জক। বিকেল থেকে লোকজন আসতে শুরু করেন এবং উৎসবমুখর হয়ে উঠে সম্মেলন প্রাঙ্গন।

সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরু হয় শনিবার অপরাহ্নে। অনুষ্ঠানের শুরুতে সম্মেলনের কনভেনর ডঃ ইউনুস রাহী আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে মঞ্চে ডেকে উপস্থিত দর্শকদের মাঝে পরিচয় করিয়ে দেন। সম্মেলনের উদ্বোধন ঘোষণা করে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে মন্তব্য করেন যে প্রবাসে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির এ ধরনের কর্মকান্ড অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক এবং প্রশংসনীয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন সম্মেলন সচিব কাজী মশহুরুল হুদা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের শেষ ভাগে ছিল স্থানীয় শিল্পীদের সঙ্গীতানুষ্ঠান, পরিচালনায় চিন্ময় রায় চৌধুরী।

সম্মেলন প্রাঙ্গন

মূল মঞ্চের বাইরে উন্মুক্ত সম্মেলন প্রাঙ্গনটি ছিল কলকাকলিতে মুখরিত। এখানে বসেছিল রকমারী মেলা - স্টল ছিল নানা ধরনের। মুক্তধারা থেকে বইপত্র নিয়ে এসেছিলেন বিশ্বজিত সাহা। বইয়ের স্টলে ছিল দুই বাংলার বইপত্র, গানের সিডি এবং পত্র-পত্রিকা। এখানে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এবং ইমদাদুল হক মিলনও বসেছিলেন দর্শকদের অটোগ্রাফ দেবার জন্যে। এছাড়াও স্টল ছিল সদ্যপ্রকাশিত বাংলা মাসিক পত্রিকা 'পড়শী'র, লস এঞ্জেলেস-এর স্থানীয় বাংলা পত্রিকা 'বাংলা বার্তা'র। খাবার-দাবার, শাড়ি কাপড় আর স্থানীয় বাংলাদেশী ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোর স্টল মিলে এ প্রাঙ্গনটি ছিল বৈচিত্রে ভরপুর।

'পড়শী'র প্রকাশনা উৎসব

আমাদের সদ্যপ্রকাশিত মাসিক পত্রিকা 'পড়শী'র প্রকাশনা উৎসব অনুষ্ঠিত হলো ৬ষ্ঠ উত্তর আমেরিকা সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনে। ২৬শে মে অপরাহ্নে সম্মেলনের মূল মঞ্চে অনুষ্ঠিত এ উৎসবে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন সম্মেলনের প্রধান অতিথি দুই বাংলার জনপ্রিয় সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। স্যান হোজে এলাকার পেশাগতভাবে ব্যস্ত জীবনযাত্রায় এমন একটি উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় 'পড়শী'র দীর্ঘায়ু কামনা করেন। পত্রিকার নাম প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে 'পড়শী' একটি বহুমাত্রিক শব্দ। বিশ্ববাঙালী আমরা যেমন সবাই একে অন্যের পড়শী, তেমনি আবার মানুষ নিজেও তার পড়শী। 'পড়শী' পত্রিকা বিশ্বের বাঙালীদের একত্রিত করার পাশাপাশি ব্যক্তির আত্ম অন্বেষার খোরাক জোগালে এ প্রচেষ্টা সার্থক হবে বলে তিনি মন্তব্য করেন। প্রকাশনা উৎসবে 'পড়শী'র পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন নির্বাহী সম্পাদক ডঃ মাহমুদুল হাসান। তিনি 'পড়শী' পত্রিকার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বর্ণনা করে বলেন যে প্রবাসী বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি অনুরাগীদের পৃষ্ঠপোষকতা, সহযোগিতা এবং অংশগ্রহণ এ প্রকাশনার সাফল্যের জন্য অপরিহার্য। সাংস্কৃতিক সহযাত্রায় তিনি বাংলা ভাষাভাষী সবাইকে আন্তরিক আমন্ত্রণ জানান।

সেমিনার

সম্মেলনের অনুষ্ঠানসূচীতে ছিল বেশ কয়েকটি সেমিনার। সেমিনারগুলোতে সবসময়ই দর্শক-শ্রোতার অভাব পরিলক্ষিত হয় এবং এবারের সম্মেলনেও সে অভাব ছিল হতাশাব্যাঞ্জক। এ পরিস্থিতি পরিবর্তনের জন্য কিছু উদ্যোগ নেয়া অত্যাবশ্যক। তা না হলে 'আমরাই বলি, আমরাই শুনি' এ জাতীয় কর্মকান্ডের কোন সার্থকতা আছে বলে মনে হয় না।

অন্যান্য অনুষ্ঠান

সম্মেলনের অনুষ্ঠানে বৈচিত্র ছিলো যথেষ্ট। শনিবার অপরাহ্নে যাদু পরিবেশন করেন যাদুকর তারেকুল ইসলাম। আয়োজিত হয়েছিল একটি আলোকচিত্র প্রদর্শনী। লস এঞ্জেলেসের বিভিন্ন বাংলা সংগঠন এবং শিল্পীদের অনুষ্ঠান ছিল দু'দিনই, শনিবার এবং রবিবার সন্ধ্যাবেলা। রবিবার অপরাহ্নে ছিল কবিতার অনুষ্ঠান 'কাব্য জলসা'। শনিবার সন্ধ্যার বিশেষ আর্কষণ ছিলেন দুই অতিথি শিল্পী শিবাজী চট্টোপাধ্যায় ও অরুন্ধতী হোমচৌধুরী। হলভর্তি দর্শক-শ্রোতারা এই দুই জনপ্রিয় শিল্পীর গান প্রাণভরে উপভোগ করতে চাইলেও সময়ের স্বল্পতার দরুণ দর্শকদের ঘরে ফিরতে হয় অতৃপ্ত পিয়াস নিয়ে। রবিবারের অনুষ্ঠানে প্রবীন কণ্ঠশিল্পী বশীর আহমদের সঙ্গীত পরিবেশনের কথা থাকলেও তিনি ছিলেন অনুপস্থিত।

পড়শী প্রতিবেদন

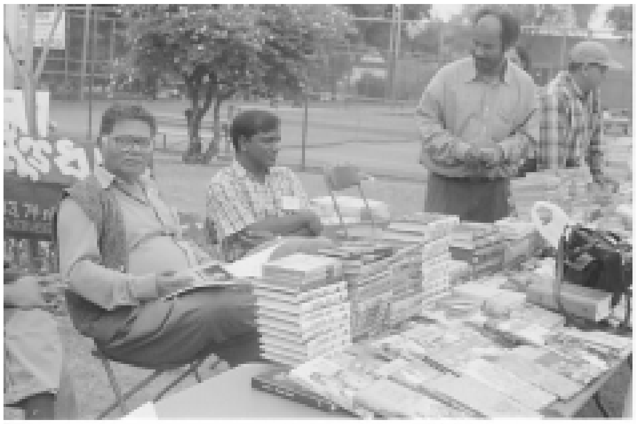

চিত্রে উত্তর আমেরিকা সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন, লস এঞ্জেলেস (ক্রম উপর থেকে নীচে এবং বা থেকে ডানে) :
১) সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন কনভেনের ডঃ ইউনুস রাহী,
২) উদ্বোধনী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের একটি নৃত্য,
৩) সম্মেলনের উদ্বোধন ঘোষণা করে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখছেন প্রধান অতিথি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়,
৪) মুক্তধারার বইয়ের স্টলে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়,
৫) সম্মেলনের আলোকচিত্র প্রদর্শনীর একটি অংশ।

তুলির স্বপ্ন

মীজান রহমান

তুলির বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। ব্র্যাডফোর্ডে তার যে খালা আছেন সেই খালার ছোট ননদের ভাশুরের ছেলে। ভালো ঘর। সম্ভ্রান্ত। বিষয়সম্পত্তির অভাব নেই। পরগনার সবাই তাদের চেনে। ছেলের বাবাকে সামনে দেখলে জেলার হাকিমও সালাম করে। দুই বছর হজ্বে গেছেন। বাড়িতে পাকা দালানের মসজিদ। এমন ঘরে রাজ কপাল ছাড়া বিয়ে হয়না কারো।

আত্মীয়স্বজন সবার কাছেই জানান দেওয়া হয়েছে। ডেট্রয়টের বড় মামা মত দিয়েছেন। লস এ্যাঞ্জেলেসের সুলতান কাকা বলেছেন উত্তম প্রস্তাব। মন্ট্রিয়লের কুরবান কাকা টেলিফোন করে বলেছেন আলহামদুলিল্লাহ। দেশের মুরুব্বিরাও সবাই দোয়া পাঠিয়েছেন। তুলির বাবা খুশি। তুলির মা খুশি। এপাড়ার বন্ধুবান্ধব অনেকেই খবর পেয়েছে। ও পাড়াতেও খবর চলে গেছে। শুধু তুলির কাছে খবরটা পৌঁছায়নি এখনো।

বাবা মা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তুলির কাছে এক্ষুনি খবরটা পৌঁছানো প্রয়োজন নেই। সামনে তার পরীক্ষা। দ্বাদশ শ্রেণীর শেষ পরীক্ষা। তার জন্যে রাত জেগে পড়ছে বেচারী। পড়ুক বিয়ের কথা বললে তাতে বাঁধা পড়তে পারে। তাছাড়া মেয়ে তো এখনো নাবালিকা। ষোলতে পড়তে আরো দুমাস বাকি। এখনো সে বাচ্চাদের মত ব্যবহার করে মাঝে মাঝে। ছোট ভাইদের সঙ্গে ঝগড়া করে। জন্মদিনে পছন্দমত উপহার না পেলে অভিমান করে। রাতের বেলা সে টেডি বেয়ারটিকে কোলে নিয়ে ঘুমোয়। হাজার বকাবকি আর মারধোর করেও অভ্যাসটাকে ছাড়ানো গেলো না। ঘুমানোর পর ওটাকে আলগোছে সরাবার চেষ্টা করেছেন তার মা। তৎক্ষণাৎ সে চেঁচিয়ে উঠে ঘুম থেকে, আমার টেডি কোথায়। টেডি কোথায়। এমন মেয়ে কি তার বিয়ের খবর দেওয়া যায় ?

বয়সে নাবালিকা হলেও দেখতে মোটেই নাবালিকা নয় তুলি। এ বয়সের অন্যান্য বাঙালী মেয়েদের তুলনায় রীতিমত পাহাড় পর্বত। দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে শেয়ান ডাগর মেয়ে। বুক ফুলেছে। গাল ফুলেছে। কনুই থেকে কব্জি পর্যন্ত লোমে ভরে গেছে দুটি হাত। কেউ বলবে না পনর বছরের মেয়ে, বলবে কুড়ি একুশ। মামারবাড়ির ধাঁচ পেয়েছে সে। তার নানীও এরকম ছিলেন দেখতে। লম্বায় নাকি নানার চেয়ে একহাত উপরে থাকতেন। পাশেও তাই। তুলির বাবা-মার ভয় এই মেয়েকে এখন বিয়ে না দিলে পরে বিয়ে দেওয়া যাবে না। এই বিদেশ বিভূঁইতে ক'টা ভালো ঘরের মুসলমান বাঙালী চাইবে একটা ঐরাবতের সাথে ঘর করতে।

তুলি। নামটা সুন্দর। ওটা তার আসল নাম নয়। আসল নাম মোসাম্মাৎ শওকত আরা খাতুন। তুলি-নামটা তার ছোটফুফুর দেওয়া। ছোট ফুফু কলেজ পর্যন্ত পড়েছেন। তুলি নামটা সেই কলেজ পড়া নাম। তিনি ছবিও আকঁতেন গোপনে গোপনে, ও বাড়িতে ছবি আঁকা, গান করা, রেডিও কলের গান এসব নিষিদ্ধ ছিল। সবাই ঘুমিয়ে পড়লে তিনি হারিকেনের আলোতে ছবি আঁকতেন। সকাল বেলা লুকিয়ে রাখতেন তাঁর কাঠের বাক্সে। তুলির জন্মের পর ভাইয়ার কাছে আব্দার করলেন ভাইঝির ডাকনাম তিনিই রাখবেন। নামটা বাবা, মা, দাদা, দাদী কারো পছন্দ হয়নি। দেবদেবীর নাম না হলেও কেমন হিন্দুয়ানী নাম। কিন্তু ছোট ফুফুর প্রতি সবার ভীষণ একটা দুর্বলতা ছিল সেই ছোটবেলা থেকেই। বাবা মার শাসন থেকে আগলে রাখতেন সবসময়। তাঁর ছবি আঁকার কথাটা তিনি জানতেন ঠিকই, কিন্তু কাউকে বলেননি। ছোটফুফুর পক্ষ নিয়ে ওকালতি করেছিলেন যাতে তাঁর বিয়েটা স্থগিত রেখে আর্ট স্কুলে ভর্তি করানো হয়। ওকালতিতে তাও হয়নি কিছুই। মুসলমান ঘরের মেয়েরা সেকালে আর্ট স্কুলে যেত না। বিয়ের সময় ছোটফুফুকে অনেক গয়নাপত্র কিনে দিয়েছিলেন তুলির বাবা। তখন দেশ মাত্র স্বাধীন হয়। বাবা মুক্তিযুদ্ধে যোগ না দিলেও তলে তলে অনুভূতি ছিল স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য। তাঁর পরিবার পাকিস্তান সমর্থক হওয়া সত্বেও। এখন বাবা অনেক বদলে গেছেন। এখন তিনি মেয়েদের উচ্চশিক্ষা পছন্দ করেন না। স্কার্ফ ছাড়া মেয়েদের বাইরে যাওয়া পছন্দ করেন না। তবুও বোনের আবদার মেনে নিয়েছিলেন তিনি। হিন্দুয়ানী নাম হওয়া সত্বেও। ডাকনামে কি আসে যায়। আসল নামটাই তো আসল।

নামটা খুব পছন্দ তুলির। নামটা সহজ, সরল, নিরহংকার। নামটাতেই ছোটফুফুর ব্যর্থ জীবনের ছাপ। নামটা আধুনিক। এই নামটা ছাড়া তুলির জীবনের আর কিছুই আধুনিক নয়। অন্যান্য মেয়েদের মত সে মাঠে গিয়ে দৌঁড়ুতে পারে না, ভলিবল, বাস্কেটবল খেলতে পারে না। এই মেয়ে ছুটিতে সহপাঠীদের সাথে মুভিতে যেতে পারে না, পপ মিউজিক শুনতে পারে না। এ সবই নিষিদ্ধ তার জন্য। এমনকি ছবি তোলাটাও তার বাবার পছন্দ হয়নি। দশ বছর পর থেকেই সে সালোয়ার কামিজ পরে। হিজাব পরে। ক্লাশের বন্ধুরা তার হিজাব নিয়ে ঠাট্টা করে। জিজ্ঞেস করে তার সব চুল পেকে গেছে কিনা। সে হিজাব পরতে চায় না। বিশেষ করে গরমের দিনে। হিজাব পরে হাঁপিয়ে ওঠে। কিন্তু তাকে পরতে হয়। হিজাব পরতে না চাইলে তাকে দেশে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। বাবা নোটিশ দিয়ে রেখেছেন অনেক আগেই।

তুলি দেখতে ভালো নয়। সে কৃষ্ণবর্ণ, সে স্ফীতকায়, বিশালবক্ষ, ভীমকায়। কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না। তার চেহারা দেখে পাত্রপক্ষ বিয়ের প্রস্তাব পাঠায়নি। তার চেহারার চাইতে তার পাসপোর্টের দাম অনেক বেশি। ঐ পাসপোর্টে যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি ছাপ। যখন ইচ্ছে তখনই সে নিউইয়র্ক থেকে প্লেনে চড়ে যেকোন দেশে চলে যেতে পারে, আবার নিউ ইয়র্ক ফিরে আসতে পারে নিশ্চিন্ত মনে। তার ছাড়পত্র আছে এদেশের। এই ছাড়পত্রই তার আসল চেহারা। এই ছাড়পত্রই তার বড় গুণ। আর কোন গুণের প্রয়োজন নেই। তাকে বিয়ে করতে পারলে তার ব্র্যাডফোর্ডের খালার ছোটননদের আদরের নন্দনটিকে দেশে থেকে কষ্টের জীবনযাপন করতে হবে না। তুলির ছাড়পত্র তো তারই ছাড়পত্র। তুলির মত মেয়েদের অন্যকোন যোগ্যতার দরকার হয় না। তারা জন্ম থেকেই যোগ্য পাত্রী। সোনার পাল্লায় করেও তাদের মূল্যায়ন করা যায় না।

পাড়ার মন্দ লোকদের মাঝে কানা ঘুষা চলছে যে পাত্রপক্ষ এরি মধ্যে উত্তরার দশকাঠা জমি দলিল করে দিয়েছে পাত্রীর পিতাকে। বিয়ে হয়ে গেলে সিলেট শহরে একটা বাড়ি নিয়ে দেবার চুক্তিও নাকি সই করা হয়েছে।

সুতরাং তুলিকে তার বিয়ের খবর দেওয়ার সময় হয়নি এখনো। শুধু বলা হয়েছে, পরীক্ষা হয়ে গেলে সে দেশে যাবে। সবাই মিলেই যাবে, লম্বা ছুটি নিয়ে। দুমাস, তিন মাস। হয়ত তারও বেশি। তুলি দেশে যেতে ভালবাসে। বিশেষ করে মামাবাড়ি। নানা আর মামা খালারা তাকে ভীষণ আদর করে। তার যত সাধ আহ্লাদ, যত মান অভিমান সবকিছু সে প্রাণভরে মেটাতে পারে ওখানে। সবচেয়ে ভালোলাগে তার মামাবাড়ির ঢিলেঢালা ভাবটা। ওখানে গিয়ে সে বড়ুইগাছে উঠে বড়ুই খেতে পারে। জোরে হাসতে পারে, মামাতোভাইদের সাথে ঠাট্টা মস্করা করতে পারে, এমনকি তাদের বন্ধুবান্ধবদের সাথে বসে লুডু খেলতেও বাঁধা দেয় না কেউ। নিউইয়র্কের বাসার তুলনায় দেশের মামাবাড়ির বিধিনিষেধ প্রায় নেই বললেই চলে। নানা নিজে খুব পরহেজগার মানুষ, কিন্তু বাড়াবাড়ি পছন্দ করেন না। তিনি মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়েন কিন্তু ইমাম সাহেবদের বাড়িতে এনে মিলাদ পড়ান না কখনো। ওটা নাকি ইসলাম বিরোধী প্রথা। অদ্ভুত কথাবার্তা তাঁর। মেয়েদের ব্যাপারেও তিনি খুব উদার মানুষ। মামার বাড়ির পুকুরে সে সাঁতার কেটেছে দু'বছর আগেও। মামাতো- ভাইবোনদের সাথে পানি ছিটিয়ে খেলা করেছে। তুলির সংসারে মামাবাড়িই একমাত্র জায়গা যেখানে গিয়ে সে কিশোরী হতে পেরেছে। তাই দেশে যাবার কথা উঠলেই তার মন নেচে ওঠে। এবার অবশ্য তার বাবা ঠিক করে রেখেছেন তুলিকে মামাবাড়িতে যেতে দেওয়া হবে না। শুধু তুলি নয় কোন ছেলেমেয়েকেই তিনি ও বাড়িতে যেতে দেওয়া পছন্দ করেন না। এ বাড়ির ধরনধারা তাঁর ভালো লাগে না। ছেলেপিলেদের বেশি আশকারা দেয় তারা। মেয়েদের আব্রু মানে না। ও বাড়ির আছর বড় খারাপ আছর। তাছাড়া তুলিতো আর ছোট খুকিটি নয়। দুদিন পর পনর পেরিয়ে ষোলতে পড়বে। শাদীর কথাবার্তা সব ঠিক। আল্লা চাহেত নিকা হবে জুলাই মাসের দশ তারিখে। সেটা তুলি না জানলেও আর তো সবাই জানে। নানা, মামাদের আহ্লাদে সে যদি আবার পুকুরে ডুব দেয়, আর সে খবর কোনক্রমে পৌঁছতে পারে বরপক্ষের কানে তাহলে তো সর্বনাশ। বিয়ে বন্ধ হবে, উত্তরার দশকাঠা জমি যাবে। সিলেটের আনকোরা বাড়িটাও যাবে। বিয়ের পর যদি সে যেতে চায় যাক, সেটা তাঁর দায়িত্ব নয়, কিন্তু এখন আর যেতে পারবেনা সে। সেটাও তুলির কানে পৌঁছানো হয়নি। তাই সে পরীক্ষার পড়ার ফাঁকে ফাঁকে মামাবাড়ির কথা ভাবে। কল্পনার ফানুস উড়িয়ে দেয় দেশের পথে। তার কিশোর মনে নূপুর বেজে ওঠে। কল্পনা করতে খুব ভালো লাগে তুলির।

সে কল্পনাবিলাসী। সে স্বাপ্নিক। এত অদ্ভুত অবাস্তব স্বপ্ন তার। সে স্বপ্ন দেখে গ্রীষ্মের রাতে বন্ধু বান্ধবদের সাথে দল বেঁধে সেন্ট্রাল পার্কে যাবে মাইকেল জ্যাকসনের কনসার্ট দেখার জন্য। সে স্বপ্ন দেখে কলম্বিয়ার এক সহপাঠিনী বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে রাত কাটাবে। দু'জনের মাঝে খুব ভাব। কতদিন বলছে বন্ধু, আয়না এই একদিন আমাদের বাড়িতে। সারারাত গল্প করবো। দুপুর বারোটা পর্যন্ত ঘুমোবো। আমার মা এসে কলম্বিয়া প্যানকেক আর কফি দিয়ে যাবে ঘরে। কি মজা হবে। বন্ধু জানেনা কত অসম্ভব কথা ওটা। কত অবাস্তব। তার স্বপ্ন রোজারিও নামের একটি পানামিয়ান ছেলের সাথে রোববার বিকেলে মুভি দেখতে যায়। ছেলেটি কত কাকুতি মিনতি করেছে তাকে। মুভিতে গিয়ে এদেশের ছেলেমেয়েরা মাখনদেওয়া নোন্‌তা ভুট্টাভাজা খায়। কোক, পেপসি, স্প্রাইট খায়। সে-ও এদেশের মেয়েদের মত মুভি দেখতে দেখতে পেপসি আর নোন্‌তা ভুট্টাভাজা খেতে চায়। কিন্তু তুলিতো এদেশের মেয়ে নয়। স্কুল থেকে বাড়িতে ফেরার সাথে সাথেই তো তার দেশটা বদলে যায়। সেটা সে রোজারিওকে বোঝাবে কেমন করে। ছেলেটাকে কেন জানি তার বড় ভালো লাগে। শুধু এক ক্লাশে পড়েই না তারা। কেমিস্ট্রির ল্যাব ক্লাশেও পাশাপাশি টেবিলে বসে ল্যাব করে। একজনের এক্সপেরিমেন্টে আরেকজন সাহায্য করে। একজনের ভুল আরেকজন দেখিয়ে দেয়। তুলির হাত থেকে একটা টিউব পড়ে গেলে রোজারিও আরেকটা টিউব এনে দেয় তার কাছে। মেঝে থেকে ভাঙ্গা টিউবের কাঁচ পরিষ্কার করে। তুলির জন্মদিনে সে কার্ড দেয়, ফুল দেয়। ওর ফুল দেওয়া দেখে ক্লাশের অন্যান্য ছেলেরা শিষ দিতে শুরু করে। মেয়েরা বাজে ইঙ্গিত করে শব্দ করে। ভীষণ লজ্জা হয় তুলির। রাগ ধরে রোজারিও ওপর। সবাইকে দেখিয়ে ফুল দেওয়ার কোন প্রয়োজন ছিল না। একটা জন্মদিন মাত্র, আর তো কিছুই নয়। রোজারিওকে খুব গাল দিতে ইচেছ করে তুলির। রোজারিওর ফুলগুলো সে তার লকারে ভরে রেখে দেয়। বাড়িতে নিতে সাহস পায় না। কোন ছেলের কাছ থেকে পাওয়া ফুল নিয়ে বাড়িতে ঢোকার মত বাড়িতে সে বাস করে না। তাই সে একলা বিছানায় শুয়ে শুয়ে স্বপ্নের জাল বোনে। রোজারিওর কথা ভাবে।

তুলির স্বপ্ন ডাক্তার হবে। কিম্বা হবে প্রাণীবিজ্ঞানের বড় গবেষক। স্কুলের বায়োলজী ক্লাশের সে সেরা ছাত্রী। মাসিক পরীক্ষায় ভালো নাম্বার পেয়েছে। কেমেস্ট্রিতেও সে শতকরা ছিয়ানব্বই পেয়েছিল গেল টেষ্টে। তার বায়োলজির শিক্ষক তাকে উৎসাহ দিচ্ছেন হার্ভার্ড বা প্রিন্সটনে ভর্তির দরখাস্ত করার জন্য। বড় ক্যারিয়ারের সবচেয়ে সুগম পথ বড় কলেজ। শিক্ষকের বিশ্বাস জিনভিত্তিক আধুনিক প্রাণীবিদ্যায় তুলি ভাল করবে। তুলির নিজেরও ঝোঁক সেদিকে। ক্লোনজাত মেষকণ্যা ডলির জন্মবৃত্তান্ত পড়েছে সে। সে আধুনিক গতিধারার খবর রাখে। তার স্বপ্ন নোবেল পুরস্কার পাওয়া কোন জিনবিজ্ঞান ল্যাবরেটরীতে গবেষণা করার সুযোগ পাবে। তার বায়োলজীর শিক্ষক বলেছেন কঠোর পরিশ্রম করতে পারলে অনেক অসাধ্য সাধন করতে পারবে সে জীবনে। আজকে যেটা শুধুই স্বপ্ন কালকে সেটা হবে বাস্তব।

কিন্তু বাংলাদেশের একটা গোঁড়া পরিবারের যে আরো একটা বাস্তবতা আছে সেটা তার বায়োলজীর শিক্ষক জানেন না। তিনি জানেন না যে নোবেল পুরষ্কারের চেয়েও অসাধ্য জিনিষ আছে জীবনে যাকে অতিক্রম করার সাধ্য তাঁর পনেরো বছরের সেরা ছাত্রীটির নেই। তিনি জানেন না যে জুলাই মাসের দশ তারিখে তার বিয়ে হয়ে যাবে তার ব্র্যাডফোর্ডের খালার ছোটননদের ভাশুরের পুত্রের সাথে। তিনি জানেন না যে তুলিকেও বলা হয়নি সেকথা। তুলিকে বলার প্রয়োজন মনে করেনি তার বাবা। তুলির মতামত এখন অবান্তর। মতামত দেবার বয়স হয়নি এখনো। মতামত দেবার বয়স ওদেশের মেয়েদের হয়না। বিয়ের আগ পর্যন্ত পিতার মত-ই কন্যার মত। বিয়ের পর স্বামীর মত-ই স্ত্রীর মত। এমনকি স্বামী না থাকার পরও পুত্রের মত-ই হয় মাতার মত।

সুতরাং তুলি স্বপ্ন দেখতে চায় দেখুক। আকাশকুসুম স্বপ্ন তার আকাশেই থাকবে। দেশে সেই যে ছেলেটি বসে আছে জুলাই মাসের দশ তারিখের অপেক্ষায় তারও একটা স্বপ্ন আছে সেটা আকাশ থেকে নিচে নেমে আসবে। একটা মেয়ের স্বপ্ন চুর্ণ না হলে কি একটা ছেলের স্বপ্ন পূর্ণ হতে পারে কোনদিন। ❑

অটোয়া, কানাডা।

বাংলাদেশের ক্রিকেট : অগ্রগতি ও লক্ষ্য

দুলাল মাহমুদ

জাতীয় গৌরব ক্রিকেট

ক্রিকেটের গৌরবময় আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছে বাংলাদেশের ক্রিকটে। টেস্ট ক্রিকেটের ১২৩ বছরের ইতিহাসে দশম দেশ হিসেবে টেস্ট স্ট্যাটাস পাওয়াটা আমাদের জন্য পরম আনন্দ ও গৌরবের। এই কিছুদিন আগেও যা ছিল স্বপ্ন, এখন তা বাস্তব। আসলে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে এগোলে কোনো কিছু অধরা থাকে না। লক্ষ্যের সঙ্গে যদি ইচ্ছা, আন্তরিকতা ও প্রচেষ্টা যোগ হয়, তাহলে কাঙ্খিত গন্তব্যে পৌঁছানো কঠিন কোন ব্যাপার নয়। এ কারণেই বাংলাদেশের ক্রিকেটে একটির পর একটি ধাপ অতিক্রম করে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছাতে পারছে।

ক্রিকেটে এ ভূখন্ডের এতিহ্য থাকলেও তা এখনো আমাদের আবেগকে স্পর্শ করতে পারেনি। পারেনি সংস্কৃতির অংশ হতে। কিন্তু ১৯৯৭ সালের ১৩ এপ্রিল আইসিসি ট্রফিতে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর ক্রিকেট খুব দ্রুত জাতীয় গৌরবে পরিণত হয়। একই বছর ১৫ জুন ওয়ানডে স্ট্যাটাস, ১৯৯৯ সালে বিশ্বকাপ অভিষেক এবং পাকিস্তান ও স্কটল্যান্ডকে হারানোর পর বাঁধ ভাঙ্গা জোয়ারের মত ক্রিকেটের আবেদন সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। একই সঙ্গে ইন্ডিপেন্ডেন্স কাপ, মিনি বিশ্বকাপ, এশীয় টেস্ট চ্যাম্পিয়নশীপের ফাইনাল, এশীয় একাদশ ও বিশ্ব একাদশের ক্রিকেট ম্যাচ এবং এশীয় কাপ ক্রিকেট আয়োজন করে আমরা সাংগঠনিক ক্ষেত্রে যেমন দৃঢ়তার পরিচয় দেই, তেমনিভাবে আমাদের দর্শকরা হয়ে ওঠেন বড় সম্পদ। সেই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, যুব, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের, বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড সভাপতি সাবের হোসেন চৌধুরী এবং সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আশরাফুল হকের ক্রিকেট কূটনীতি ২৬ জুন লন্ডনে আইসিসিরি সভায় টেস্ট স্ট্যাটাস পেতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ইতিমধ্যে ২০০০ সালের ১০ নভেম্বর দেশের মাটিতে ভারতের সঙ্গে অভিষেক টেস্ট খেলেছে বাংলাদেশ। জাতীয় ক্রিকেট লীগ পেয়েছে প্রথম শ্রেণীর মর্যাদা।

ক্রিকেট এখন আমাদের জাতীয় সম্পদে পরিণত হয়েছে। ক্রিকেট এখন শুধু খেলা নয়, দেশাত্মবোধের উৎস ও ঐক্যের প্রতীক। ক্রিকেট আমাদের জাতীয় গৌরব ও আত্মবিশ্বাসকে জাগিয়ে তুলেছে। আমাদের লাল-সবুজ পতাকার এই প্রিয় মাতৃভূমিকে নিয়ে সারা বিশ্বে অবজ্ঞা আর উপেক্ষা। বিশ্বের যে কোনো ইমিগ্রেশনে দাঁড়ালে আমাদের অবস্থানটা পরিমাপ করা যায়। এই অবস্থা পরিবর্তনের সময় এসেছে। মাতৃভাষা দিবস এবং ক্রিকেট আমাদের জাতীয় গৌরবকে ফিরিয়ে এনেছে। আশা করা যায়,এতে অন্যেরা অনুপ্রাণিত হবেন। শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান, অর্থনীতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে আমরা যদি সফল হতে পারি, সেদিন জাতি হিসেবে আমরা আরো বেশি গৌরবান্বিত হতে পারবো। এ ক্ষেত্রে ক্রিকেট আমাদের পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন করবে। এজন্যে আমাদের টার্গেট নির্ধারণ করতে হবে।

বাংলাদেশের টার্গেট

সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে চলেছে বাংলাদেশের ক্রিকেট। ক্রিকেটে যে নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে এর অন্যতম রূপকার হলেন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের সভাপতি সাবের হোসেন চৌধুরী। বিশ্ব ক্রিকেটে বাংলাদেশকে প্রতিষ্ঠিত করার নতুন স্বপ্ন, প্রত্যাশা ও অঙ্গীকারের কথা জানিয়ে তিনি বলেছেন, "আমরা ইতিমধ্যে স্বপ্নকে স্পর্শ করেছি। কিন্তু পরিপূর্ণতা সেদিন হবে, যেদিন অস্ট্রেলিয়ার মত ক্রিকেট খেলতে পারবো। আমরা এখন আর অতীতমুখী ও বর্তমাননির্ভর হতে চাই না। আমরা ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি দিতে চাই।" সাবের হোসেন চৌধুরী বলেছেন, "আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে আমরা দুই ধাপ এগিয়ে যেতে চাই এবং আগামী দশ বছরের মধ্যে আমরা সেরা পাঁচটি দেশের মধ্যে থাকতে চাই। সারাদেশে ক্রিকেটকে ছড়িয়ে দেবার জন্য ইতিমধ্যে আমরা ব্যাপকভিত্তিক কর্মসূচী নিয়েছি। তৃণমূল পর্যায় থেকে ক্রিকেটার তুলে আনার জন্য আমরা সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।"

তৃণমূল পর্যায়ে ক্রিকেট

সারাদেশের তৃণমূল পর্যায় থেকে প্রতিভাবান ক্রিকেটার বাছাই করা হচ্ছে। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের অনূর্ধ্ব-১৩, অনূর্ধ্ব-১৫ ও গ্রামীণ অনূর্ধ্ব-১৭ ক্রিকেট কর্মসূচীর আওতায় শ্রীলংকা থেকে আগত ৪ জন ও দেশীয় ২৮ জন প্রশিক্ষকের তত্ত্বাবধানে প্রতিটি জেলা থেকে ক্রিকেটার বাছাই করার পর বিভাগীয় পর্যায়ে ট্রায়ালের ব্যবস্থা করা হয়। বিভাগীয় পর্যায়ে বাছাইকৃতদের নিয়ে প্রতি বিভাগে ৬টি অর্থাৎ ছয় বিভাগে ৩৬টি দল গঠন করা হয়। এ দলগুলোকে নিয়ে বয়সভিত্তিক টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়েছে। বয়সভিত্তিক এ টুর্নামেন্ট হতে জাতীয় বয়সভিত্তিক দল গঠনের লক্ষ্যে প্রতিটি গ্রুপের জন্য ৩০ জন করে খেলোয়াড় বাছাই করা হবে। তিন গ্রুপের বাছাইকৃত ৯০ জন ক্রিকেটারকে জাতীয়ভাবে তিন মাসের বিশেষ প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। এদের মধ্য থেকে নির্বাচিতরা বয়সভিত্তিক বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পাবেন। ইতিমধ্যে এ প্রক্রিয়া থেকে উঠে এসেছেন জাতীয় দলের দুই প্রতিভাবান ক্রিকেটার মোহাম্মদ শরীফ ও মোহাম্মদ আশরাফুল।

বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড তৃণমূল পর্যায় থেকে প্রতিভাবান ক্রিকেটার গড়ে তোলার এ কার্যক্রমকে দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে বাস্তবভিত্তিক আরো পদক্ষেপ নিয়েছে। ক্রিকেট বোর্ড প্রতিটি জেলার জন্য ১ জন করে, প্রতি বিভাগের জন্য ২ জন করে এবং কেন্দ্রীয়ভাবে ২০ জন ক্রিকেট প্রশিক্ষক স্থায়ীভাবে নিয়োগ দিচ্ছে। এই প্রশিক্ষকরা তৃণমূল পর্যায় থেকে প্রতিভাবান ক্রিকেটার খুঁজে বের করবেন। অনেকটা শ্রীলংকাকে অনুসরণ করে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড যে পদক্ষেপ নিয়েছে, তা দারুণ সাড়া জাগিয়েছে। ক্রিকেটকে কেন্দ্র করে দেশে যে উন্মাদনার সৃষ্টি হয়েছে, তাকে কাজে লাগিয়ে এ দেশের ক্রিকেটের অবস্থান সুসংহত করা হচ্ছে। আসলে টেস্ট স্ট্যাটাস পাবার পর বাংলাদেশ ক্রিকেটের অভিজাত সারিতে ঠাঁই করে

নেবার পাশাপাশি দায়িত্বও অনেক বেড়েছে। কেননা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে খেলার গৌরব অর্জন করলেও খেলার মান তেমন আশানুরূপ নয়। খেলার মান বৃদ্ধি এবং নতুন নতুন ক্রিকেটার গড়ে তোলাটাই এখন বাংলাদেশের প্রধান লক্ষ্য।

পেশাদার কাঠামোয় ক্রিকেট

বাংলাদেশের ক্রিকেট পেশাদারিত্বের দিকে এগিয়ে নেয়ার জন্য যে মডেলটি অনুসরণ করছে, তা অনেকটা অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার সিস্টেমের সংমিশ্রণ। ইতিমধ্যে জাতীয় দলের জন্য ২২ জন ক্রিকেটারের সঙ্গে চুক্তি করা হয়েছে। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড তাদেরকে প্রতি মাসে বেতন প্রদান করছে। একইভাবে জেলা, বিভাগ ও জাতীয় পর্যায়ে মাসিক বেতনের ভিত্তিতে কোচ নিয়োগ দেয়া হয়েছে। দেশীয় কোচ তৈরির জন্য বিদেশ থেকে কোচ আনা হয়েছে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের আম্পায়ার স্টিভ বাকনারের তত্ত্বাবধানে আম্পায়ার্স প্যানেল গঠন করা হয়েছে। বিভিন্ন ক্রিকেটভেন্যুর পিচ আধুনিকায়ন করা হচ্ছে। বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে সীমিত আকারে ক্রিকেট জিমন্যাসিয়াম চালু করা হলেও তা বড় আকারে করার পরিকল্পনা রয়েছে। বাংলাদেশের সাবেক কোচ দক্ষিণ আফ্রিকার এডি বার্লোর প্রস্তাব অনুযায়ী প্রতিটি জেলার জিমন্যাসিয়ামকে বহুমুখী করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে, যাতে ইনডোর ক্রিকেট খেলা যায়। পেশাদার প্রশাসনিক কাঠামোর অংশ হিসেবে নির্বাচনের মাধ্যমে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের ৩১ সদস্যের বোর্ড অব ডাইরেক্টরস গঠন করা হয়েছে।

ক্রিকেট ডেভলপমেন্ট ফাউন্ডেশন

বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের সাথে আগামী ১০ বছরের চুক্তি হয়েছে নবগঠিত বাংলাদেশ ক্রিকেট ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশনের। ফাউন্ডেশন দেশব্যাপী তৃণমূল পর্যায়ে প্রতিভাবান ক্রিকেটারদের খেলার সুযোগ ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সফল ক্রিকেটারে পরিণত করার লক্ষ্যে জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদান এবং উন্নয়নমুখী কার্যক্রম পরিচালনা করবে। ওয়েব-সাইট (ইন্টারনেট)-এর মাধ্যমে ক্রিকেট কার্যক্রম স্থানীয় ও আন্ত-র্জাতিক পর্যায়ে বিসিবির পক্ষে বিস্তৃতি ও প্রসারের লক্ষ্যে বিসিবির অফিসিয়াল ওয়েবসাইট নিজ খরচে স্থাপন ও পরিচালনা, ওয়েব পেইজে যে কোন তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে বিসিবি'র সাথে আলোচনাসাপেক্ষে প্রচার করবে। বাংলাদেশকে কেন্দ্র করে সকল ধরনের স্থানীয় ও আন্ত র্জাতিক ইন্টারনেট প্রচার স্বত্ব ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশনের থাকবে। যার মেয়াদ হবে ১ সেপ্টেম্বর ২০০০ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০১০।

শ্রীলংকা ও জিম্বাবুয়ে মডেল

বাংলাদেশের ক্রিকেটের উন্নয়নের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হলেই এসে পড়ে শ্রীলংকা ও জিম্বাবুয়ের নাম। এক সময় আইসিসি ট্রফিতে বাংলাদেশের প্রতিদ্বন্দ্বী এ দুটি দেশ বিশ্ব ক্রিকেটে এখন সমীহ জাগানো অবস্থান করে নেয়ায় তাদের মডেল বাংলাদেশের জন্য অনুসরণীয় হয়ে উঠেছে। কেননা শ্রীলংকা, জিম্বাবুয়ে ও বাংলাদেশের ক্রিকেট ইতিহাস ও ঐতিহ্য অনেকটা অভিন্ন। বৃটিশ ঔপনিবেশিকতার জের ধরে এ তিনটি দেশ ক্রিকেটে সম্পৃক্ত হয়েছে। তা সত্ত্বেও শ্রীলংকা ও জিম্বাবুয়ের সঙ্গে বাংলাদেশের রয়েছে দুস্তর ব্যবধান। এ বিষয়ে বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক রকিবুল হাসানের অভিমত হচ্ছে, 'বৃটিশরা বসবাসের সূত্রে শ্রীলংকা ও জিম্বাবুয়েতে ক্রিকেটের সংস্কৃতি ও অবকাঠামো গড়ে তুলেছে। স্বাভাবিক নিয়মেই এ দেশদুটির ক্রিকেট শক্ত ভিতের উপর দাঁড়িয়েছে। যে কারণে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে পা দেয়ার আগ থেকেই শ্রীলংকা ও জিম্বাবুয়ে খুঁজে পেয়েছে তাদের ইপ্সিত ঠিকানা। অবশ্য আরো আগেই তাদের টেস্ট স্ট্যাটাস পাওয়া উচিত ছিল। পক্ষান্তরে বাংলাদেশে বৃটিশদের পদচারণা তেমন ছিল না। এর কারণে এখানে ক্রিকেট সংস্কৃতি ও অবকাঠামো তেমনভাবে গড়ে ওঠেনি।' প্রাথমিক অবস্থায় বাংলাদেশ শ্রীলংকা ও জিম্বাবুয়েকে অনুসরণ করলেও টেস্ট স্ট্যাটাস পাবার পর এ ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন হয়েছে। বাংলাদেশের এখন মডেল অস্ট্রেলিয়া। ইতিমধ্যে তাদের সঙ্গে এ বিষয়ে চুক্তি হয়েছে বাংলাদেশের। তদুপরি বিশ্ব ক্রিকেটে অস্ট্রেলিয়ার এখন যে অবস্থান, যে পর্যায়ে যেতে আমাদের অনেক দিন অপেক্ষা করতে হবে। এ মুহূর্তে শ্রীলংকা ও জিম্বাবুয়ের মত যদি খেলতে পারি সেটাই হবে আমাদের বড় পাওয়া। ওয়েস্ট ইন্ডিজের গ্যারি সোবার্স ও অস্ট্রেলিয়ার হোয়াটমোরের প্রশিক্ষণে শ্রীলংকান ক্রিকেটে অভূতপূর্ব পরিবর্তন ও সাফল্য এসেছে। জিম্বাবুয়ের প্রথম প্রধান নির্বাহী ডন আর্নট এবং তার উত্তরাধিকারী ডেভ এলম্যান-ব্রাউনের অসাধারণ পেশাদার সাংগঠনিক দক্ষতায় জিম্বাবুয়ের ক্রিকেট উজ্জীবিত ও সুসংহত দলে পরিণত হয়েছে। বিশেষ করে এ দুটি দেশের স্কুল ক্রিকেট, স্পোর্টিং উইকেটসমৃদ্ধ মাঠ, কোচিং, আধুনিক সুবিধাদি, পেশাদার দৃষ্টিভঙ্গী সর্বোপরি পজিটিভি এপ্রোচ তাদেরকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

বিসিবি-এসিবি চুক্তি

পাঁচ বছরের জন্য দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষর করেছে ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) এবং অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট বোর্ড (এসিবি)। গত ১০ ও ১১ ফেব্রুয়ারী মেলবোর্নে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ব্রিকেট কাউন্সিল (আইসিসি)-এর সভা চলাকালীন সময়েই স্বাক্ষরিত হয় এই চুক্তি। এই দ্বিপাক্ষিক চুক্তির সুফল পাবে বাংলাদেশ। এই পাঁচ বছর মেয়াদের চুক্তির মধ্যে আছে অস্ট্রেলিয়া 'এ' ও অনূর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেট দলের সাথে বাংলাদেশের হোম এ্যান্ড এ্যাওয়ে সিরিজ, দু'জন ক্রিকেটারকে প্রতিবছর বৃত্তি দান, একাডেমী গড়তে সাহায্য করা, কোচ-আম্পায়ারদের প্রশিক্ষণসহ বিসিবি'র অফিসিয়াল ব্যাপারেও সহায়তা করবে এসিবি।

দশসালা টেস্টসূচীতে বাংলাদেশ

আইসিসি তাদের মেলবোর্ন মিটিংয়ে যে দশসালা টেস্টসূচী ঘোষণা করেছে, তাতে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে বাংলাদেশকে। এই দশসালা টেস্টসূচী অনুযায়ী আগামী দশ বছরে টেস্ট খেলুড়ে প্রতিটি দেশ পরস্পরের সাথে কমপক্ষে একটি হোম এবং একটি এ্যাওয়ে সিরিজ খেলবে। প্রতিটি সিরিজ হবে কমপক্ষে দুটি টেস্ট ম্যাচের। প্রথম পাঁচ বছরের মধ্যেই প্রত্যেক দেশকে অন্তত একবার করে পরস্পরের বিরুদ্ধে ২ টেস্ট ম্যাচের হোম কিংবা এ্যাওয়ে সিরিজ খেলতে হবে। আইসিসি বাংলাদেশকে যে দারুণ গুরুত্ব দিয়েছে এই টেস্ট সূচী প্রণয়নে তার প্রমাণ হলো বাংলাদেশই হচ্ছে একমাত্র দেশ, যারা প্রথম পাঁচ বছরেই বাকি ৯টি দেশের সাথেই হোম এ্যান্ড এ্যাওয়ে সিরিজ খেলবে। অর্থাৎ অন্যদের জন্য যেটা দশ বছরের সূচী বাংলাদেশের ক্ষেত্রে তা প্রথম ৫ বছরেই সমাপ্ত হয়ে যাবে।

অনেক পথ দিতে হবে পাড়ি

বাংলাদেশের ক্রিকেট এখন একটি প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলেছে। এ পক্রিয়ার অংশ হিসেবে বাংলাদেশ একটির পর একটি ধাপ অতিক্রম করে চলেছে। লক্ষ্য ও পথ ঠিক থাকলে বাংলাদেশ নি:সন্দেহে একদিন বিশ্ব ক্রিকেটে প্রতিষ্ঠিত শক্তি হিসেবে অবস্থান নিতে পারবে। তবে এজন্য সময় প্রয়োজন। আমরা সেই অপেক্ষায় থাকলাম। ❑

ক্রীড়া সাংবাদিক,
ঢাকা।

নাট্য মহলের টুকরো খবর

চলচিচত্রে শমী কায়সার

ছোট পর্দার নন্দিত অভিনেত্রী শমী কায়সার এই প্রথমবারের মতো সেলুলয়েডের ফিতেয় বন্দী হতে চলেছেন। রূপালী পর্দায় শমী কায়সারকে দেখা যাবে একটি অন্যধারার চলচ্চিত্রে। বাংলাদেশের বাউল সাধক হাসন রাজার জীবনী নিয়ে খ্যাতিমান চিত্র পরিচালক চাষী নজরুল ইসলামের পূর্ণ দৈর্ঘ্য বাংলা ছায়াছবি ''হাসন রাজা'' নির্মাণ হতে যাচেছ। এ ছবিতে শমী অভিনয় করবেন হাসান রাজার ২য় স্ত্রীর চরিত্রে। হাসান রাজার জীবনীভিত্তিক এই চলচ্চিত্রটির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন অধ্যাপক মমতাজউদ্দিন আহমেদ।

পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত বিপাশা

অনার্স শেষ করে বসে ছিলেন বিপাশা হায়াত। সেশন জটের কারণে এতদিন মাস্টার্স এর ক্লাস শুরু করতে পারেননি। সম্প্রতি মাস্টার্স এর ক্লাস শুরু হওয়ায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন পড়াশোনায় বিপাশা। পরীক্ষার জন্য নিয়মিত প্রস্তুতি নিচ্ছেন-আর পাশাপাশি নাটক। উল্লেখ্য, বিপাশা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটের পেইন্টিং-এর ছাত্রী।

আর্সেনিক বিষয়ে নার্গিস আক্তারের ''পাতালপুরীর গল্প''

আর্সেনিক বাংলাদেশের এক ভয়াবহ সামাজিক সমস্যা। এ বিষয়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন করার জন্য আয়োজন চলছে টেলিফিল্ম ''পাতালপুরীর গল্প'' নির্মাণের। এর চিত্রনাট্য লিখেছেন সিরাজুল করীম। নার্গিস আক্তার পরিচালিত এই টেলিফিল্মের রোমান্টিক চরিত্রে অভিনয় করবেন সঙ্গীত শিল্পী শুভ্রদেব, তার বিপরীতে রয়েছে চিত্র নায়িকা পূর্ণিমা। এছাড়াও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে থাকবেন চম্পা, ডলি জহুর, মাহফুজ আহমেদ ও আবুল হায়াত। এর কাজ শুরু হবে জুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে।

টেলিফিল্মে ঈশিতা

বাংলা টেলি ফিল্মের ব্যানারে এই প্রথম অভিনয় করছেন ঈশিতা। কিছুদিন আগে তিনি শেষ করলেন এই ব্যানারের ''ওম'' নামের একটি নাটকের কাজ। এই নাটকে ভিন্ন মাত্রার চরিত্রে দেখা যাবে ঈশিতাকে। ঢাকা ও টাঙ্গাইলের বিভিন্ন লোকেশনে চিত্রায়িত নাটকটি বিটিভিতে দেখা যাবে।

মে মাসে ঢাকার বিনোদনাঙ্গন

সিনেমা

দুই দুয়ারী	:	এ ছবিটি হুমায়ুন আহমেদ পরিচালিত- চলছে মধুমিতা ও বলাকায়।
হিম্মত	:	চলছে এশিয়া, আনন্দ, অভিসার, স্টার, বিডিআর, পূরবী, সৈনিক ক্লাব, জোনাকী, চিত্রমহল, আগমন, পুনম ও সাগরিকায়।
হিরো নাম্বার ওয়ান	:	এ ছবিটি চলছে পদ্মা, রাজমণি, পূর্ণিমা, লায়ন, আজাদ ও সনি সিনেমায়।

মঞ্চ (গাইড হাউজ)

৯ মে	:	বিকেলে গাইড হাউজে পরিবেশিত হলো ''ঢাকা নান্দনিকের স্রোত''
১০ মে	:	বিকেলে ছিল লোক নাট্যদলের ''কঞ্জুস''
১২ মে	:	সকালে নবারুন থিয়েটারের ''সুখ সমাপ্ত বিন্দু'' বিকেলে হলো ''ফকিরের মা''
১৩ মে	:	বিকেলে ছিল বাংলাদেশ থিয়েটারের ''সি মোরগ''
১৪ মে	:	বিকেলে ''বঙ্গজ নাট্যম''
১৫ মে	:	নাট্যদলের ''হুল'' আর কুহেলিকার নাটক
১৬ মে	:	স্বরবীথির নাটক ''নো ফটকাবাজ''
১৭ মে	:	নাগরিক নাট্য সম্প্রদায়ের নাটক ''বর্ণচোরা''
১৮ মে	:	নটরাজ থিয়েটারের ''সন্ধ্যাতারা''
১৯ মে	:	থিয়েটার আর্ট ইউনিট এর ''কোর্ট মার্শাল''
২০ মে	:	আরামবাগের নাটক ''রূপবান''

প্রদর্শনী

চারুকলায়	:	৫ থেকে ১৭ মে- বাংলাদেশ ফটোগ্রাফিক সোসাইটি (বিপিএস)-এর চিত্র কর্ম প্রদর্শনী।
দৃক গ্যালারীতে	:	১১ থেকে ১৬ মে-শিল্পী আবু সেলিমের ষষ্ঠ একক চিত্র প্রদর্শনী। এ প্রদর্শনীতে আছে ''একাত্তরের দিনগুলো'' শীর্ষক জলরঙ ও তৈলচিত্র। মূলত মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক চিত্রমালা দিয়ে সাজানো তার প্রদর্শনী।

সুমী কাজী (ঢাকা থেকে)

বহুলালোচিত হিন্দী ছবি

পেয়ার তুনে কেয়া কিয়াঃ হলিউড হিট 'ফেইটাল এট্রাক্শন' এর পুনর্নির্মাণ। রাজাত মুখার্জী পরিচালিত ও রামগোপাল ভার্মা প্রযোজিত ছবিটি তুলে ধরেছে ভালোবাসার এক ভিন্ন রূপ - ভয়াবহ রূপ। ফারদিন খান ও উর্মিলা মাতন্দকার জুটি দ্বিতীয়বারের মত অভিনয় করছে। এখানে

রামগোপাল ভার্মার ছবিতে। অভিনয়ে আরও আছেন সোনালী কুলকারনী ও সুরেশ ওবেরয়।

আলবেলা: দিপক সারিন পরিচালিত ছবিটি নির্মিত হয়েছে মালাগাতে। ভারতের গোয়া-তে অবস্থিত এক মোহনীয় শহর। প্রধান চরিত্র টনি (গোভিন্দ), একজন সদাহাস্যময়ী, প্রাঞ্জল ট্যুরিস্ট গাইড। এক জ্যোতিষীর ভবিষ্যদ্বাণী-তার জীবনে এক বিদেশিনীর (আশওয়ারিয়া রায়) আগমন যার আবির্ভাব হবে শুধু স্বপ্নরাজ্যেই - বদলে দেয় টনির ঘর চিরসুখময় জীবনযাত্রা। এ ছবিতে আরও অভিনয় করেছেন জ্যাকি শ্রফ ও নামরাতা সিরোধগের।

আমেরিকান দেশী : ছবিটি মূলত জন্মসূত্রে আমেরিকান ও আমেরিকাবাসী ভারতীয় যুবক-যুবতীদের একদিকে ভারতীয় ঐতিহ্য, অন্যদিকে, আকর্ষণীয় আধুনিক পশ্চিমী প্রথার ভারসাম্য রক্ষার প্রচেষ্টা। তেমনই এক যুবক কৃষ্ণ রেত্তীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে হাস্যরসাত্মক গল্পটি। কৃষ্ণ (ক্রিস সম্বোধনে বেশী আগ্রহী) অপেক্ষারত স্বাধীন কলেজ জীবনের প্রারম্ভে - যেখানে সে পুরোপুরিভাবে বিচ্ছিন্ন থাকতে চাইছে নিজ সংস্কৃতি থেকে - এতেই যেন সার্থক হবে তার পরিপূর্ণ আমেরিকান হবার বাসনা। অভিনয়ে আছেন দীপ কাটদের, পূর্বা বেদী, রনবীর লাহিরী, রিজওয়ান মানজী, কাল পেন।

সংগ্রহ : রুমা হক

আপনার স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য

ত্বকের চর্চা

রূপটান # ১

রোদে বেশি বের হওয়ার দরুন অনেকের গায়ে কালোছোপ পরে এবং এর সাথে ত্বকের রুক্ষতাও বাড়ে। ত্বকের কালোছোপ ও রুক্ষতা দূর করতে প্রয়োজন ছোট একটি টমেটো। আধাটি গাজর ও ছোট এক ফালি লেবু। সব উপাদানগুলো ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করে নিন। খুব শুষ্ক ও পরিণত ত্বক হলে মেশান ২ চা-চামচ দুধ ও টেবিল চামচ আটা। তৈলাক্ত ত্বক হলে দুধ দেবেন না। এ মিশ্রণটি মুখে ও গলায় লাগান। ১০-১৫ মিনিট পর মিশ্রণটি শুকিয়ে গেলে কুসুম গরম পানিতে মুখ ধুয়ে ফেলার পর, ঠান্ডা পানিতে আবার মুখ ধুয়ে ফেলুন। সপ্তাহে ২ দিন ব্যবহার করুন।

রূপটান # ২

ত্বকে স্ক্রাব করা সবসময় ত্বকের জন্য উপকারী। শীতকালে ধুলো, ময়লা এবং ত্বকের রুক্ষতা বেড়ে

যায় অপরিসীমভাবে। ঘন ঘন স্ক্রাব করা সেক্ষেত্রে জরুরী হয়ে পরে। কমলালেবুর খোসাতো সহজেই পাওয়া যায়। একটি কমলালেবুর খোসা ব্লেন্ডারে পেস্ট করে নিন। এক চা-চামচ এই পেস্ট। এক চা চামচ ওটমিল। এক চা চামচ এমন্ড পাউডার নিয়ে এক সঙ্গে মেশান ও তাতে দুধ দিয়ে পেস্ট তৈরী করুন। এই পেস্ট ত্বকে লাগান ও অল্প শুকিয়ে গেলে ঘষে ঘষে তুলুন। তৈলাক্ত ত্বক হলে দুধের বদলে কমলার রস ব্যবহার করুন। সপ্তাহে অন্ততঃ একবার স্ক্রাব করুন।

সংগ্রহ : টিনা (ক্যালিফোর্নিয়া থেকে)

রান্না-বান্না

অস্বস্তিকর গরমে শীতল পানীয়

স্ট্রবেরী ড্যাকারী

উপকরণ : হিমায়িত স্ট্রবেরী ড্যাকারী শরবত মিশ্রণ ১ ক্যান (গ্রোসারীতে ফ্রোজেন শরবত বিভাগে পাবেন), স্ট্রবেরী ১০-১২টি, বরফ ৮-১০ টুকরো।

প্রণালী : সব উপকরণ প্রয়োজন মত পানি সহ মিক্সারে ব্লেন্ড করে সুদৃশ্য গ্লাসে পরিবেশন করুন।

কাঁচা আমের শরবত

উপকরণ : কাঁচা আম ২টি, চিনি স্বাদমত, বিটলবণ অল্প, পুদিনাবাটা, ভাজা জিরা গুড়া ১ টেবিল চামচ।

প্রণালী : কাঁচা আম সেদ্ধ করে নরম করে নিন। খোসা ছাড়িয়ে পেস্ট বানান। তারপর পুদিনাবাটা, চিনি, লবণ, জিরাগুড়া, আমের পেস্ট পানি দিয়ে একত্রে মেখে নিন। ঠান্ডা করে তাজা পুদিনা পাতা ওপরে ছড়িয়ে বরফ টুকরা দিয়ে পরিবেশন করুন।

কালো আঙুরের শরবত

উপকরণ : কালো আঙুর (১/২ পাউন্ড), বিট লবণ অল্প, পুদিনা পাতা ৪টা।

প্রণালী : আঙুর ভালো করে ধুয়ে নিন। ব্লেন্ডারে সামান্য পানি দিয়ে বিট লবণ, পুদিনা পাতা সহ আঙুর দিন। মিশ্রণ ছাকনিতে ছেঁকে কাঁচের গ্লাসে ঢেলে বরফকুচি দিয়ে পরিবেশন করুন।

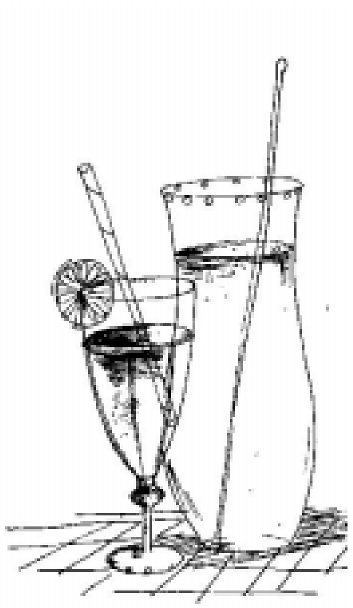

ইটালিয়ান সোডা

উপকরণ : সিরাপ (গ্রোসারিতে ফল, বাদাম, চকলেট নানান স্বাদের “torani” ব্র্যান্ডের সিরাপ পাওয়া যায়), কার্বোনেটেড পানি, বরফ।

প্রণালী : কার্বোনেটেড পানি, বরফ ও স্বাদমত সিরাপ মিশিয়ে লম্বা রঙিন গ্লাসে পরিবেশন করুন।

মনামী

বাংলাদেশের এটর্নি জেনারেলের সঙ্গে আলাপচারিতা

বাংলাদেশের এটর্নি জেনারেল জনাব মাহমুদুল ইসলাম ব্যক্তিগত সফরে কানাডায় এসেছিলেন মে মাসের শেষ সপ্তাহে। প্রচণ্ড ব্যস্ততার মাঝে এটর্নি জেনারেল সফরের দিন কটা কাটালেন তার বড় ছেলের বাসায় ছেলে, ছেলের বউ, আর সদ্যজাত পৌত্রের সান্নিধ্যে।

এই স্বল্প সময়ের মাঝেও জনাব মাহমুদুল ইসলাম সহাস্যে রাজী হলেন পড়শী'র সাথে একান্ত সাক্ষাৎকারে। রাজধানী Ottawa সংলগ্ন Kanata শহরে বড় ছেলের বাসায় ঘরোয়া পরিবেশে অনেকটা সময় দিলেন এটর্নি জেনারেল পড়শী'র প্রতিনিধির সাথে ।

পড়শী [প] : ব্যস্ত জীবনের মাঝে কয়েকদিনের অবসর নিয়ে আপনার পৌত্রকে দেখে বেশ উৎফুল্ল মনে হচ্ছে আপনাকে।

এটর্নি জেনারেল [এ. জে.] নিশ্চয়ই, এর চেয়ে আনন্দদায়ক আর কি হতে পারে?

প : আপনার দৃষ্টিতে বাংলাদেশের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি এখন কেমন? বছর দশেক আগের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির সাথে এখনকার তুলনা করবেন কি?

এ. জে. : বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার আগে থেকেই আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ক্রমাগত অবনতি ঘটছে। দশ বছর আগে যে অবস্থা ছিল তা বর্তমান অবস্থার চেয়ে ভাল ছিল, সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। আমরা সকলেই চাইবো দেশের আইন ও শৃঙ্খলার উন্নতি হোক।

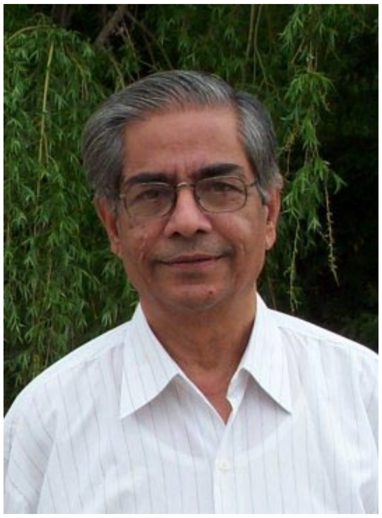

এটর্নি জেনারেল মাহমুদুল ইসলাম

প : আপনার বিচারে বর্তমান সরকারের সবচেয়ে বড় সফলতা কি? অন্যদিকে সরকারের সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা বা দুর্বলতাই বা কি?

এ. জে. : কৃষি ও খাদ্য উৎপাদন ক্ষেত্রে এবং গ্রামাঞ্চলে উন্নতির ক্ষেত্রে বর্তমান সরকার সবচাইতে উল্লেখযোগ্য সফলতা লাভ করেছে। অন্যদিকে বিভিন্ন কারণে আইন ও শৃঙ্খলার অবনতি রোধ করতে না পারা এই সরকারের ব্যর্থতার একটা দিক।

প : আপনার নেতৃত্বে এটর্নি জেনারেল অফিসের সবচেয়ে বড় সফলতা কি?

এ. জে. : বিগত কয়েক বছরে কর আদায়ের ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা আনয়ন করতে এটর্নি জেনারেলের অফিস বিশেষ অবদান রেখেছে। নিজের অফিসের সুনাম নিজে করতে চাই না। তবে এ ব্যাপারে একটু খোঁজ খবর করলেই দেখতে পাবেন কতটা উন্নতি হয়েছে গত কয়েক বছরে।

[পড়শী আরও কিছুটা detail -এর জন্য অনুরোধ করলেও অমায়িক মাহমুদুল ইসলাম মৃদু হেসে আবারও বলেন নিজের গুণগান নিজের না করাই উচিৎ]

প : যুক্তরাষ্ট্রের এটর্নি জেনারেলের বিরুদ্ধে প্রায়শই অভিযোগ আসে সরকারী দলের স্বার্থে কাজ করার জন্য। এটর্নি জেনারেল কাজে আপনিও সরকার কর্তৃক নিয়োজিত, এ অবস্থায় কাজ করার ক্ষেত্রে আপনার স্বাধীনতা কতটুকু?

এ. জে. : এটর্নি জেনারেলের পদ একটি সাংবিধানিক পদ এবং এটর্নি জেনারেল সংবিধান এবং অন্যান্য আইন সংক্রান্ত মতামত সরকারকে প্রদান করে থাকে। সরকারী দলের যে নীতিই থাকুক না কেন, এটর্নি জেনারেলকে যে মতামত দিতে হয় তা সংবিধান ও দেশের প্রচলিত আইনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হয়। আমার স্বাধীন মতামত প্রকাশের ব্যাপারে বর্তমান সরকার কোন সময়েই আমার উপর কোন রকম চাপ সৃষ্টি করেনি, ফলে সরকারী দলের স্বার্থে সংবিধান ও আইনের পরিপন্থী কোন মতামত দেয়ার কোন প্রশ্নই উঠেনি।

যুক্তরাষ্ট্রের এটর্নি জেনারেলের সরকারী নীতিমালা প্রণয়নে যে ভূমিকা রয়েছে বাংলাদেশের এটর্নি জেনারেলের সেরকম কোন ভূমিকা নেই। ফলে বাংলাদেশের এটর্নি জেনারেলের সরকারী দলের স্বার্থে কাজ করার কোন প্রশ্নই উঠে না।

প : অনেকদিন থেকেই শুনে আসছি যে, 'বাংলাদেশে টাকা দিয়ে বিচার এবং বিচারককে কেনা যায়' - এ প্রেক্ষিতে কোন মন্তব্য করবেন কি?

এ. জে. : যিনি বিত্তশালী তিনি অভিজ্ঞ ও নামী-দামী আইনজীবী নিয়োগ করতে পারেন এবং অভিজ্ঞতার কারণে এই আইনজীবীদের সফলতার হার অনেক বেশী। এই অভিজ্ঞ আইনজীবীদের পারিশ্রমিক অনেক বেশী হওয়ার কারণে সাধারণ ও নিম্নবিত্ত পরিবার ইচ্ছা করলেও তাদেরকে নিয়োগ করতে পারে না, এই অর্থে আমি বলবো কোন কোন ক্ষেত্রে অর্থবান লোকেরা তাদের পক্ষে বিচারের রায় পেতে সক্ষম। ক্ষমতাবান ব্যক্তিরা অনেক ক্ষেত্রে বিচারকে তাদের পক্ষে নিয়ে আসতে সক্ষম — এ রকম দৃষ্টান্ত নেই তা আমি বলবনা। তবে এ রূপ উদাহরণ সংখ্যায় অতি নগণ্য এবং পাকিস্তান আমল থেকেই এরূপ উদাহরণ পাওয়া যাবে। ওকালতি একটা পেশা হলেও এর সমাজ সেবামূলক দিক রয়েছে। অভিজ্ঞ আইনজীবীগণ যদি

তাদের সামাজিক দায়িত্ব পালনে ব্রতী হন এবং বিচারকগণ যদি তাদের সুবিচার করার দায়িত্ব সম্বন্ধে সজাগ হন তবে এই সমস্যা সমাধান করা সম্ভব। এ দায়িত্ববোধকে জাগিয়ে তোলার জন্য প্রচুর আলোচনা-সমালোচনা হওয়া প্রয়োজন।

প : বিরোধী দলগুলো অভিযোগ করে আসছে যে তাদের কর্মকান্ডে বাধা দেয়ার জন্যে তাদের নেতা ও কর্মীদের বিনা কারণে বা সামান্য অজুহাতে কারাগারে পাঠানো হচ্ছে। এ ব্যপারে আপনার মন্তব্য কি?

এ. জে. : অভিযোগটি দু'একটা ক্ষেত্রে সত্য হলেও ঢালাওভাবে অভিযোগটি সত্য নয়। বিরোধী দলের কোন সদস্য কোন অপরাধ করলে এবং সেই অপরাধের বিচারের প্রক্রিয়া চালু করলেই উদ্দেশ্যমূলকভাবে একে রাজনৈতিক রূপ দেয়া হয়, যাতে অপরাধের শাস্তি না হয়। এটাকে প্রশ্রয় দিলে দেশে আইনের শাসন ব্যাহত হবে এবং দেশে দু'রকম আইন চালু হবে — যারা রাজনীতি করেন তাদের জন্য এক রকম আইন আর যারা করেননা তাদের জন্য আরেক ধরনের আইন।

প : শত্রু সম্পত্তি সম্পর্কিত নতুন আইনের সুযোগ নিয়ে বিশেষ মহল ও মাস্তানরা সাধারণ মানুষদের হয়রানী করছে বলে শুনতে পাই, এ প্রেক্ষিতে আপনার মন্তব্য কি?

এ. জে. : শত্রুসম্পত্তি আইনের সুযোগ নিয়ে অনেক সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সম্পত্তি বেহাত করা হয়েছে এবং সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের প্রতি অবিচার করা হচ্ছে। নতুন আইনটি তাদের প্রতি সুবিচার করার প্রচেষ্টা। শত্রুসম্পত্তি হিসাবে যারা সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সম্পত্তি দখল করে আছেন, তারাই এ আইনের সমস্যা ও অপব্যবস্থা সম্পর্কে অভিযোগ ও রটনা করে আসছেন। একটু তলিয়ে দেখলেই দেখা যাবে যে অভিযোগটি পুরোপুরিভাবে ভিত্তিহীন।

প : স্বাধীনতার পর থেকেই বিচার বিভাগকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেয়া নিয়ে কথা হচ্ছে। এ ব্যাপারে কতটা অগ্রগতি হচ্ছে?

এ. জে. : এ ব্যাপারে সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগ সরকারকে কতগুলো পদক্ষেপ নেয়ার নির্দেশ দিয়েছে এবং সরকার এ নির্দেশ পালনে যথাযথ পদক্ষেপ নিচ্ছে। তবে ব্যাপারটা সময় সাপেক্ষ এবং একই সাথে আইনের কিছু পরিবর্তন প্রয়োজন রয়েছে কিনা তা সরকার বিবেচনা করে দেখছেন।

প : আপনি কি মনে করেন বর্তমান আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে বিরাজমান অচলাবস্থার সঙ্গে বিচার বিভাগীয় স্বাধীনতার প্রশ্নটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত?

এ. জে. : বিচার বিভাগীয় স্বাধীনতার সঙ্গে বর্তমান আইন ও শৃঙ্খলা অবনতির কোন সরাসরি যোগাযোগ নেই। তবে বিচারে বিলম্ব জনমনে কিছুটা হতাশার সৃষ্টি করে এবং নিজের হাতে আইন তুলে নেবার প্রবণতা সৃষ্টি করে।

প : বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করে দেয়াটা কি দেশের জন্য মঙ্গলজনক হবে? গত বছর দশেকের ছাত্ররাজনীতি কি দেশ ও জাতির জন্য কোন সুফল এনেছে?

এ. জে. : স্বাধীনতার আগে এবং পরেও ইতিহাস দেখলে দেখা যাবে ছাত্ররা রাজনীতিতে যথেষ্ট বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছে এবং যার সুফল সারাদেশ এবং জাতি পেয়েছে। বর্তমান ছাত্র রাজনীতি কোন মঙ্গল বয়ে আনছে বলে মনে করিনা। বরং অনেক ক্ষেত্রেই সমাজে ক্ষতিবৃদ্ধি করছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে আমি ছাত্র রাজনীতির কোন প্রয়োজনীয়তা দেখি না।

প : সম্প্রতি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বেশ কয়েকজন সাংবাদিক রাজনৈতিক পান্ডাদের হাতে লাঞ্ছিত হয়েছেন। এটর্নি জেনারেল অফিস কি এ ব্যাপারে নাগরিক অধিকার লঙ্ঘনের দায়ে মামলা আনতে পারে?

এ. জে. : এটর্নি জেনারেলের দায়িত্ব সীমাবদ্ধ। তাকে সুপ্রীমকোর্টে সরকারী মোকদ্দমা পরিচালনা করতে হয় এবং বিভিন্ন আইন সংক্রান্ত বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ দিতে হয়। নাগরিক অধিকার লঙ্ঘন বা অনুরূপ বিষয়ে মোকদ্দমা দায়ের করা এটর্নি জেনারেলের দায়িত্বের আওতায় পরে না।

প : হরতাল কি সংবিধানের পরিপন্থী? হরতাল বিরোধী মিছিল বা বল প্রয়োগে হরতাল রোধের চেষ্টা করাটা কি আইন সঙ্গত?

এ. জে. : হরতালের দু'টা রূপ। একটা রূপ হচ্ছে — লোককে অনুরোধ করা কাজে যোগদান না করার জন্যে আর অন্য রূপ হচ্ছে — বল প্রয়োগ করে বা বল প্রয়োগের হুমকি দিয়ে লোককে কাজে যোগদানে বিরত করা। প্রথম রূপের হরতাল কোন অপরাধ নয় এবং সংবিধানে সংরক্ষিত বাক্ স্বাধীনতার একটা অঙ্গ। প্রথমরূপের হরতালে বাধা দেয়া আইনসঙ্গত নয়। কিন্তু দ্বিতীয় রূপের হরতাল শাস্তিযোগ্য অপরাধ এবং এরকম হরতাল জনগণের মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী। যদি কেউ এইরূপ হরতালের বিরুদ্ধে কোন আইন সঙ্গত ব্যবস্থা নেয় তা কোন অন্যায় নয়। কিন্তু হরতালকে বাধা দিতে গিয়ে অতিরিক্ত বল প্রয়োগ করলে সেটাও শাস্তি যোগ্য অপরাধ হয়ে দাঁড়ায়।

প : আপনি কি মনে করেন হরতালের ক্ষতিকর দিকগুলো কমানোর জন্য কোন নতুন আইন করা উচিৎ যাতে রাজনৈতিক দলগুলো যে কোন অযুহাতে যখন তখন হরতাল ডেকে দেশের উন্নতিতে অন্তরায় সৃষ্টি করতে না পারে?

এ. জে. : এ ব্যাপারে আইন অত্যন্ত পরিস্কার এবং নতুন কোন আইনের প্রয়োজন নেই। সমস্যা হচ্ছে হরতালটা আমাদের রাজনীতির ও সংস্কৃতির একটা অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। হরতাল কথাটা শুনলেই আমরা বাড়ীমুখে রওনা হই। কাজে যাওয়া ও কাজ করাটা যে আমাদের প্রত্যেকের মৌলিক অধিকার সেটা আমরা দাবী করি না। জনগণ যদি একবার ফিরে দাঁড়ায় এবং হরতালকে অমান্য করে, তাহলে হরতাল অর্থাৎ বল প্রয়োগের মাধ্যমে হরতাল, আমাদের সামাজিক অঙ্গন থেকে তিরোহিত হবে।

প : যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে 'Extradition Treaty' বর্তমানে কোন অবস্থায় আছে?

এ. জে. : বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের 'Extradition Treaty' সম্পাদিত হয়েছে এবং তা যুক্তরাষ্ট্রের Senate এর অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে।

প : কিছুদিন থেকে বাংলাদেশে 'ন্যায়পাল' পদ সৃষ্টি নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। প্রথমত: এটা কি সংবিধানিক? দ্বিতীয়ত: দেশে প্রচলিত আইন থাকা সত্ত্বেও 'ন্যায়পাল' কি আদৌ প্রয়োজনীয়?

এ. জে. : ন্যায়পাল একটি সাংবিধানিক পদ এবং সংবিধানের ৭৯ অনুচ্ছেদে এর বিধান রয়েছে। এ পদের প্রয়োজন রয়েছে। সুইডেন, যুক্তরাজ্যসহ অনেক দেশে ন্যায়পাল প্রশাসনিক ন্যায়পরতা রক্ষা করতে বিশেষ অবদান রেখেছে।

প: আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, ব্যস্ততার মাঝে সময় দেয়ার জন্য এবং খোলামেলা আলোচনা করার জন্যে।

এ. জে. : ধন্যবাদ।

সাক্ষাৎকার গ্রহণে : মাশুক রহমান